অশীন দাশগুপ্ত স্মারক বক্তৃতা ২০০৪

সপ্তদশ শতকের দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয় জনগোষ্ঠী

সুরেন্দ্র গোপাল

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ

Scanned with CamScanner

সপ্তদশ শতকের দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয় জনগোষ্ঠী

(১)

মাননীয় সভাপতি, বিশিষ্ট বিদ্বজ্জন, সম্মানীয় বন্ধুবর্গ এবং ভদ্রমহোদয়া ও ভদ্রমহোদয়গণ,

অশীন দাশগুপ্ত স্মারক বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে আমি নিজেকে গভীরভাবে সম্মানিত বোধ করছি। আমার আজকের ভাষণ হবে সেই অন্তরঙ্গ সুহৃদের স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন, যিনি একাধারে ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান ও উৎসর্গীকৃতপ্রাণ গবেষক, প্রেরণাদাতা শিক্ষক, সফল প্রশাসক এবং সর্বোপরি একজন সহমর্মী মানুষ। সৌজন্যের প্রতিভূ এই মানুষটি নিজের মতের স্বপক্ষে বরাবর পর্বতের মত অটল থেকেছেন।

তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল মধ্যযুগের ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য। শেষ দিন পর্যন্ত এই বিষয়টির প্রতি তিনি নিবেদিত ছিলেন। বিষয়টি তাঁর গভীর আবেগে পরিণত হয়েছিল। তিনি তাঁর পড়ানো লেখালেখি ও গবেষণার মধ্য দিয়ে বিষয়টিকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তাঁর নিরলস প্রয়াসের ফলে ভারতের ও ভারতের বাইরের গবেষকদের কাছে ভারত মহাসাগরীয় জগতটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে।

এখন একথা উপলব্ধি করা গেছে যে আফ্রিকার পূর্ব উপকূল, লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগর থেকে ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল এবং আরও পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরে কিভাবে পালতোলা জাহাজে ও নৌকায় মানুষজন ও পণ্যদ্রব্য বাহিত হত সে সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসকেও ঠিকভাবে বোঝা যাবে না। এইসব জাহাজ মালাক্কা প্রণালী ও সুন্দা প্রণালী (এই প্রণালীটি সুমাত্রা ও যবদ্বীপকে পৃথক করে রেখেছে) হয়ে চীন পর্যন্ত চলে যেত। ফিরতিপথে আসতেন দক্ষিণপূর্ব এশীয় ও চীনা বণিক-নাবিকরা। তাঁরা জাহাজ নিয়ে আসতেন ভারতের বন্দরগুলিতে, পারস্য উপসাগরে, লোহিত সাগরে এবং পূর্ব আফ্রিকার উপকূলে। চলাচলের এই নকশা মাঝেমধ্যে বদলে গেলেও বণিক ও নাবিকরা কখনও সাগর পাড়ি দিতে ক্ষান্ত হতেন না।

Scanned with CamScanner

অশীনের গবেষণা ভারতবর্ষের ভারত মহাসাগরীয় যোগসূত্রগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে গবেষকদের উদ্দীপিত করেছিল, যাতে করে ইতিহাসের গতিকে বুঝতে পারা যায়। অর্থাৎ, বুঝতে চেষ্টা করা যে কিভাবে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক উত্থানপতন ও ইউরোপীয় অনুপ্রবেশ সত্ত্বেও দেশের মধ্যযুগীয় সামুদ্রিক বাণিজ্য বেঁচে গেল। তাঁদের গবেষণা দেখিয়েছে যে কি কি কারণে এবং কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে ইউরোপীয় জাতিগুলি ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে এশিয়া ও আফ্রিকার উপকূলীয় দেশগুলিতে আধিপত্য জমাতে পেরেছিল। ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হল তা আমরা আরও ভালভাবে বুঝতে পারি। প্রথমে তাঁরা অর্থনৈতিক প্রাধান্য বিস্তার করতেন, তারপর রাজ্যদখল করতেন। সামুদ্রিক বাণিজ্যের থেকে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের জন্ম হয়। মানদণ্ডের অনুসারী হয়ে এল রাজদণ্ড।

বিগত অর্ধশতকে ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যের উপর বেশ কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে গুজরাত, মালাবার, করমণ্ডল, বাংলা প্রভৃতি অঞ্চলের ওপর গবেষণা গ্রন্থ রয়েছে। গবেষণার রসদ পাওয়া যাওয়ায় দা গামা-পরবর্তী যুগ থেকে আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় পর্যন্ত বিভিন্ন ইউরোপীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সম্পর্কে বিশদ গবেষণা করা সম্ভব হয়েছে।

প্রথম ধরণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাবে ও. পি. সিংয়ের *সুরাট অ্যান্ড ইটস্ ট্রেড ইন দি সেকেন্ড হাফ অফ দি সেভেনটিনথ সেন্চুরি* (নয়া দিল্লী, ১৯৭৫), সুশীল চৌধুরীর *ট্রেড অ্যান্ড কমারশিয়াল অর্গানাইজেশন ইন বেঙ্গল* ১৬৫০-১৭২৫ (কলকাতা, ১৯৭৫), মাইকেল পিয়ার্সনের *মার্চেন্টস অ্যান্ড রুলারস ইন গুজরাত* (ক্যালিফোর্নিয়া, ১৯৭৬) ইত্যাদি গ্রন্থে।

দ্বিতীয় ধরণের প্রবণতার উল্লেখ রয়েছে তপন রায়চৌধুরীর *ইয়ান কোম্পানি ইন করমণ্ডল* ১৬০৫-১৬৯০ (এস-গ্রাভেনহেগ, ১৯৬২), ওম প্রকাশের *দি ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অ্যান্ড দি ইকোনমি অফ বেঙ্গল* ১৬৩০-১৭৩০ (প্রিন্সটন, ১৯৮৫) প্রভৃতি গ্রন্থে।

ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যের উপর কয়েকটি বৃহৎ পরিসরের সমীক্ষার নিদর্শন হল মেইলিংক রীলোফ্‌জে'র *এশিয়ান ট্রেড অ্যান্ড ইউরোপিয়ান ইনফ্লুয়েন্স ইন দি ইন্দোনেশিয়ান আর্কিপেলাগো বিটুইন ১৫০০ অ্যান্ড অ্যাবাউট* ১৬৩০ (দ্য হেগ, ১৯৬২), হোল্ডেন ফারবারে'র *রাইভাল এম্পায়ার্স অফ ট্রেড ইন দি ওরিয়েন্ট* ১৬০০-১৮০০ (মিনিয়াপোলিস, ১৯৭৬), *কে. এন. চৌধুরী'র দি ট্রেডিং ওয়ার্ল্ড অফ এশিয়া অ্যান্ড দি ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি* ১৬৬০-১৭৬০ (কেমব্রিজ, ১৯৭৮) এবং *ট্রেড অ্যান্ড সিভিলাইজেশন ইন দি ইন্ডিয়ান ওশেন* প্রভৃতি। এছাড়াও আমাদের দেশের ও বিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ের উপর রচিত বহু অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ রয়ে গেছে।

উপরের তালিকাটিতে কয়েকটি নিদর্শন দেওয়া হল মাত্র, এটি এই বিষয়ে প্রকাশিত রচনার সম্পূর্ণ তালিকা নয়। এসবের থেকে ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়।

এসবের এক অনিচ্ছাকৃত পরিণতি হল ইংরাজি ভিন্ন অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষা যেমন ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ প্রভৃতি ভাষা চর্চার প্রতি ভারতীয় গবেষকদের আগ্রহ। এসব ভাষায় রয়েছে ভারতের ইতিহাস, বিশেষত আর্থ-সামাজিক জীবন, যেমন কৃষক ও বণিকদের অবস্থা, দুর্ভিক্ষের প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ে তথ্যভাণ্ডার। এখন আমরা মধ্যযুগের ভারতের অর্থনীতি ও সমাজ সম্পর্কে চর্চা করার ক্ষেত্রে অনেক ভাল জায়গায় এসে পৌঁছেছি।

এসব বিশদ ইতিহাসচর্চার ফলে যে তথ্যাবলী জানা গেছে তার থেকে আমাদের বহু পুরনো ধারণাকে সংশোধন করতে হয়েছে। প্রথমত, পর্তুগীজ ও পরবর্তীকালের ইংরেজ, ওলন্দাজদের উপস্থিতি ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্য থেকে ভারতীয় ও অন্যান্য এশীয় বণিকদের নিশ্চিহ্ন করে দেয় নি। ষোড়শ শতকে পর্তুগীজরা ভারতীয় বণিকশ্রেণী ও রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আপোষ করেছিলেন। ভারতীয়রা এই বাণিজ্যে সক্রিয় ছিলেন। সপ্তদশ শতকে পর্তুগীজদের থেকে অধিকতর পুঁজি, বাণিজ্যিক সক্ষমতা এবং গভীর সমুদ্রে উন্নততর আগ্নেয়াস্ত্রের অধিকারী ইংরেজ ও ওলন্দাজরাও ভারতীয়দের সঙ্গে সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। ভারতীয়রা নতুন নতুন প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সামুদ্রিক বাণিজ্য চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। গুজরাতের প্রধান বন্দর সুরাতের উপর অশীনের গবেষণা (*ইন্ডিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড দি ডিক্লাইন অফ সুরাত*, ১৭০০-১৭৫০) (ভাইজবাডেন, ১৯৭৯) এই বিষয়টিকে সামনে নিয়ে আসে।

প্রবল ইউরোপীয় প্রতিযোগিতা (যা বহুক্ষেত্রে) সশস্ত্র নির্যাতনের চেহারা নিয়েছিল। তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভারতীয় সামুদ্রিক বণিকদের বেঁচেবর্তে থাকার ঘটনাকে উদ্যোগী দক্ষতা ও ধৈর্যের এক মহান আখ্যান বলা চলে।

Scanned with CamScanner

(২)

ভারত মহাসাগরের তটবর্তী দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যের যোগাযোগের বিষয়ে চর্চা করার জন্য অশীন যে প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এখন আমি সপ্তদশ শতকের দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ভারতীয় বণিকদের সম্পর্কে কিছু বলব।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতের সঙ্গে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার যোগাযোগের ঘটনা সুবিদিত। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের মাধ্যমে এই অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক সংযোগের কথা বারংবার বলা হয়ে থাকে। এই উপমহাদেশের বাইরে অন্য আর কোনও অঞ্চলে ভারতীয় সংযোগ ও প্রভাবের সাক্ষ্যবাহী এত বিপুল সংখ্যক প্রত্নতাত্ত্বিক সৌধ নেই। আমি এক্ষেত্রে ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের বলিদ্বীপের হিন্দু জনসাধারণ, বোরোবুদুরের মন্দির এবং কম্বোডিয়ার আংকোরভাটের মন্দিরের কথা বলছি।[১]

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র বদল হলেও এই সংযোগের ধারা অব্যাহত রয়েছে।

৬৭৩ খ্রিষ্টাব্দে চীনা ভিক্ষু ই চিঙ্ বা ই ৎসিঙ্ দক্ষিণপূর্ব এশিয়া থেকে এসে তাম্রলিপ্তি বন্দরে নামেন। বার বছর তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং তারপর ৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দে তাম্রলিপ্তি থেকে জাহাজে করে সুমাত্রা দ্বীপের পালেম্বঙে এসে পৌঁছান। সেখানে ৬৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৯৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দশ বছর তিনি বাস করেন এবং দুটি গ্রন্থ রচনা করেন ঃ (১) দক্ষিণ সাগর থেকে প্রেরিত বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক প্রতিবেদন এবং (২) পশ্চিম ভূখণ্ডে ধর্মের অনুসন্ধানে নিয়োজিত প্রথিতযশা ভিক্ষুদের সম্পর্কে প্রতিবেদন।[২]

ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় প্রেরিত চোল শাসকদের অভিযান অথবা ভারতে প্রেরিত চীনা অভিযানগুলি সম্পর্কে এখানে আর বলার প্রয়োজন নেই।[৩]

আরবদের সম্প্রসারণ, বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া জুড়ে এবং তারপরেও চীনের প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল পর্যন্ত মুসলমান পথপ্রদর্শক নাবিকদের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে ভারতের সামুদ্রিক যোগাযোগ রক্ষিত হত মুসলমানদের দ্বারাও, যাঁরা কখনো ভারতের হিন্দু নাবিকদের অংশীদার হিসাবে কখনো বা তাঁদের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ কুশীলব হিসাবে বিচরণ করতেন। টিবেট্‌সে'র রচনায় দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় মুসলমানদের সম্প্রসারণের চিত্তাকর্ষক বিবরণ আছে।[৪]

[যোড়শ শতকে যখন এই অঞ্চলে পর্তুগীজরা এলেন তখন সব বন্দরেই ভারতীয়

বণিকরা তাঁদের প্রতিহত করেছিলেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় পর্তুগীজরা মালাক্কা (মেলাকা) বাণিজ্যভূমিটি দখল করে দেখেছিলেন যে সেখানকার ভারতীয়রা দুটি কাম্‌পোঙে (গ্রাম) বসবাস করছেন, একটি মুসলমানদের জন্য অপরটি অ-মুসলমান অর্থাৎ হিন্দুদের জন্য। যোড়শ শতকের প্রথম দিকের পর্তুগীজ কুঠিয়াল ও পর্যটক তোমে পিরেজ মালাক্কার অর্থনীতিতে ভারতীয়দের আধিপত্য উপলব্ধি করে তাঁর বিবরণী *দি সুমা ওরিয়েন্টাল অফ তোমে পিরেজ* (কোর্তেজাজ (অনুবাদ), লন্ডন, ১৯৪৪)-এ তার উল্লেখ করেছেন।

পর্তুগীজরা হিন্দুদের বলতেন 'ক্লিঙ্' বা 'কেলিঙ্' বা 'কলিঙ্'। পরবর্তী শতকেও ভারতের হিন্দুরা এই অঞ্চলে ঐ নামে পরিচিত ছিলেন। ভারতীয়দের অন্যান্য নাম ছিল গুজরাতি বা চেট্টি। এইভাবে তাঁরা গুজরাতিদের থেকে করমণ্ডল থেকে আসা চেট্টিদের পৃথক করতেন।

আধুনিক লেখকরা মনে করেন যে 'ক্লিঙ্' বলতে দক্ষিণ ভারত থেকে আগত তামিল, তেলেগু ও কন্নড় ভাষাভাষী মানুষদের বোঝান হত। এ কথা সত্য যে হিন্দু বণিকদের মধ্যে করমণ্ডল থেকে আগত দক্ষিণ ভারতীয়রা প্রাধান্য বজায় রেখে ছিলেন। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে করমণ্ডলের উত্তর-পূর্বে বঙ্গোপসাগর সন্নিহিত উড়িষ্যা ও বাংলা সামুদ্রিক বাণিজ্যের মাধ্যমে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলত, এবং ওড়িয়া বা বাংলাভাষী হিন্দুদের উপস্থিতিকে তাই অগ্রাহ্য করা চলে না। সমগ্র ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক ধরে গুজরাতিদের উপস্থিতির কথা জোরালভাবে বলা হয়েছে। এছাড়া, ইবন বতুতা ভারতের পশ্চিম উপকূল থেকে একটি জাহাজে করে চীনের উদ্দেশে রওনা দেনা অর্থাৎ চীন ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সঙ্গে মালাবারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। কোঙ্কনীদের গতিবিধি সম্পর্কে আমাদের তথ্যসূত্রগুলি নিশ্চুপ থাকলেও অনুমান করে নিতে পারি যে তাঁরাও বণিক রূপে এই অঞ্চলে এসেছিলেন। পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরের মত দক্ষিণপূর্ব এশীয় বন্দরগুলিতেও ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় উপকূল থেকে ভারতীয়রা এসেছিলেন এবং সেখানে বসবাস করেন।

এই আদিকল্পটি আরও জোরাল হয় এই তথ্য থেকে যে ব্রহ্মদেশের তেনাসেরিমের হিন্দুরা 'তৈলঙ্' নামে পরিচিত ছিলেন, অর্থাৎ তেলুগুভাষীদের দেশ থেকে আগত মানুষ। তবে বঙ্গোপসাগরের উপকূলের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত মানুষরাও সেখানে থাকতেন। সুতরাং, এই ভুল ছিল অনিচ্ছাকৃত।

সুতরাং, আমরা সমস্ত হিন্দুকেই 'ক্লিঙ্' নামে অভিহিত করব, তাঁরা গুজরাতি, কন্নড়, মালয়লম, তামিল, তেলুগু, ওড়িয়া বা বাংলা যে ভাষাতেই কথা বলুন না কেন।

Scanned with CamScanner

ইউরোপীয়দের ঝোঁক ছিল বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চল থেকে আগত হিন্দুদের একটি সাধারণ নামে অভিহিত করা। পারস্য ও ইয়েমেনে হিন্দুদের পরিচিতি ছিল 'বানিয়া' নামে, পারস্যের অভ্যন্তরে হিন্দুদের বলা হত 'মুলতানী', কেননা পাঞ্জাবীভাষী মানুষরা সেখানে অধিক সংখ্যায় উপস্থিত থাকতেন।

'ক্লিঙ্' বলতে বিভিন্ন অঞ্চলের হিন্দুদের বোঝান যেতে পারে যাঁরা সকলেই করমণ্ডল উপকূল থেকে আসেন নি।

অন্যান্য অঞ্চলের হিন্দুদের থেকে আলাদা করে করমণ্ডল অঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায়কে বোঝানর জন্য চেট্টি নামটি প্রায়শই ব্যবহার করা হয়েছে।

চেট্টি নামটির বারবার ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার হিন্দুদের মধ্যে করমণ্ডল থেকে আগত হিন্দু সম্প্রদায়ের উপস্থিতি সবচেয়ে বেশী নজরে পড়ে। এদের প্রভাবপ্রতিপত্তি ক্রমশ বাড়তে থাকে, কারণ সতের শতকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের সামুদ্রিক যোগাযোগ এক নতুন মাত্রা পেয়েছিল।

চেট্টি শব্দটি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়। আদিতে এর দ্বারা তামিলনাড়ুর মন্দির-শহর মাদুরাইয়ের আশি কিলোমিটার পশ্চিমে অথবা আরেক মন্দির শহরে তাঞ্জাভুর থেকে আশি কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত ছিয়ানব্বইটি গ্রামবিশিষ্ট চেট্টিনাডো অঞ্চলের বণিকদের বোঝাত।[৪] তাঁরা নগ্‌রাথের বা শহরের মানুষ নামেও পরিচিত ছিলেন। তারা দুর্গসম প্রাসাদে বাস করতেন এবং নাট্টুকোট্টাই (স্থল-দুর্গ) চেট্টিয়ার নামে পরিচিত ছিলেন।[৫] চেট্টিনাড অঞ্চলটি কাবেরী বদ্বীপ, পক প্রণালী, পক উপসাগর ও মান্নার উপসাগরের নিকটে অবস্থিত এবং শ্রীলঙ্কা ও ভারতীয় উপদ্বীপের পূর্বদিকে ও পশ্চিমদিকে ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে আরবসাগরের তটবর্তী বন্দরগুলি পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক বাণিজ্যের যোগসূত্রে আবদ্ধ ছিল।

তবে সপ্তদশ শতকে চেট্টি সম্প্রদায়ে তেলুগু ও কন্নড়ভাষী বণিকরা অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তেলুগুভাষী হিন্দু বণিকরা — কোমতি, বলিজ ও বেরি চেট্টিরা দক্ষিণ দিকে তামিলনাড়ু উপকূলে চলে আসেন এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সামুদ্রিক বাণিজ্যে সক্রিয় থাকেন।[৬] স্থানীয়ভাবে এঁরা ইদাঙ্গাই বা 'বাঁ-হাতি জাত' হিসাব তামিলভাষী চেট্টিদের (যাঁরা ভালাঙ্গাই বা 'ডান-হাতি জাত' হিসাবে পরিচিত ছিলেন') থেকে আলাদাভাবে পরিচিত হতেন। তটবর্তী অঞ্চলে তাঁরা ইজারাদার, ইউরোপীয় বণিকদের দালাল এবং মহাজনের ভূমিকাও পালন করতেন। বাণিজ্যের নানা শাখায় দক্ষতাই ছিল এই সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বন্দরগুলিতে ভারতীয় মুসলিমদের চেনা খুব শক্ত ছিল। আরব,

পারসীক, তুর্কী, পাঠানের থেকে তাঁদের আলাদা করা কঠিন ছিল।[৮] ব্যতিক্রম ছিলেন তামিলভাষী অঞ্চল থেকে আগত মানুষরা যাঁরা নিজস্ব সম্প্রদায়গত ভেদাভেদ সত্ত্বেও সকলে চুলিয়া নামে পরিচিত ছিলেন।

চুলিয়ারা অধিকাংশই আসতেন তামিলনাড়ুর রামনাড ও সন্নিহিত অঞ্চল থেকে। কিন্তু তাঁরা কোন সমসত্ত্ব গোষ্ঠী ছিলেন না।

চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকে করমণ্ডল উপকূলের দক্ষিণ প্রান্তে কিলক্করাই ও কয়ালপটনম অঞ্চলের মুসলমান বণিকরা পাণ্ড্য রাজাদের সেনাবাহিনীতে ঘোড়ার জোগান দিতেন। চীনা সূত্র অনুযায়ী পঞ্চদশ শতকের মধ্যে ব্রহ্মদেশ, সুমাত্রার যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে নেগাপটনমের বাণিজ্যিক সংযোগ গড়ে উঠেছিল। এভাবে পর্তুগীজদের আগমনের পূর্বেই দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যিক পরিমন্ডলের সঙ্গে তামিলনাড়ুর মুসলমানরা যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন।[৯]

পন্ডিচেরির দক্ষিণে কাড্ডালোর এবং কাড্ডালোরের পনের মাইল দক্ষিণে পোর্টো নোভো বন্দরদুটি চুলিয়া মুসলিমদের শক্ত ঘাঁটি ছিল। তাঁরা বড় জাহাজের মালিকও ছিলেন। স্থানীয় কিছু হিন্দুও জাহাজমালিক ও ব্যবসায়ী হয়ে ওঠেন।[১০]

ধনী চুলিয়ারা সুন্নী মতাবলম্বী ছিলেন এবং তাঁরা মারিক্কার নামে অভিহিত হতেন। "মারাইক্কায়ার মুসলিমরা পর্তুগীজদের আগমনের আগেই সুবিশাল দক্ষিণপূর্ব এশীয় বাণিজ্যভূমিতে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলেন" (সুসান বেইলি, পৃ. ৩৩৮)। তুলনায় কম স্বচ্ছলরা স্থানীয়ভাবে চুলিয়া বা লোয়েব্বে নামে পরিচিত ছিলেন। প্রাথমিকভাবে তাঁরা পক প্রণালী ও মান্নার উপসাগরে মুক্তোর সন্ধানে ও শাঁখের বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিলেন। তবে শীঘ্রই তাঁরা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে — ব্রহ্মদেশ, তেনাসেরিম, মালয়েশিয়া, শ্যাম এবং ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে নিজেদের জাহাজ নিয়ে যাত্রা করতে শুরু করেন। 'ক্লিঙ্‌দের মত অত বেশী' না হলেও ষোড়শ শতকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বন্দরগুলিতে তাদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল। মালাক্কায় তাঁদের কাম্পোঙ্ ছিল।[১১]

হিন্দু চেট্টিদের মত চুলিয়ারাও করমণ্ডল উপকূলে ইউরোপীয়দের দালাল হিসাবে কাজ করতেন। 'উত্তর করমণ্ডলে বস্ত্রের ব্যবসায়ে ওলন্দাজরা মসুলিপট্টনমের আশেপাশের ও গোলকোন্ডার মুসলিম চুলিয়াদের দালাল হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন।'[১২]

কিলক্করাইয়ের সিতক্কটি (শেখ আবদুল কাদির, ১৬৫০-১৭১৫) ছিলেন জাহাজের মালিক এবং রামনাডের শাসকের ওপর তাঁর প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশী। রামনাডের

Scanned with CamScanner

শাসক কিলাবন রঘুনাথ সেতুপতি (১৬৭৪-১৭১০) ছিলেন একজন মারাভা যোদ্ধা যিনি নিজের রাজ্যকে শক্তিশালী করে তোলেন।[১৫]

গুজরাতি মুসলমানরাও প্রভাবশালী ছিলেন, কিন্তু তাঁদের সম্প্রদায়গত প্রভেদের কথা আমরা জানি না। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গুজরাতি মুসলিম বণিক গোষ্ঠী ছিল, বোহরা, খোজা ও মেমন। সম্ভবত গুজরাতিরাই ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে ইসলামের প্রসার ঘটিয়ে ছিলেন। পর্তুগীজরা তাঁদের বিতাড়নের চেষ্টা করলেও স্থানীয় অর্থনীতিতে তাঁরা ষোড়শ শতকে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন। সপ্তদশ শতকে ওলন্দাজ ও ইংরেজ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁরা নিজেদের ব্যবসা চালিয়ে যান। ইউরোপীয়রা তাঁদের সহ্য করতেন কেননা ভারতীয় উপমহাদেশে ইউরোপীয় বাণিজ্যের কিছু বাধ্যবাধকতা ছিল, এখানে গুজরাত ছিল মহান মুঘলদের সাম্রাজ্যের একটি অংশ। গুজরাতি প্রজাদের রক্ষা করার জন্য অথবা তাঁদের হয়ে মুঘল শাসক ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন।

মালাবারি নামে পরিচিত কেরালার মুসলমানদের ঘাঁটি ছিল বাটাভিয়ায়।[১৪]

অপরদিকে ভারতের বন্দরগুলিতে বসবাসকারী বিদেশী মুসলিম গোষ্ঠীগুলি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যে সক্রিয় ছিলেন।

মসুলিপটনম বন্দরে বিশেষভাবে পারসীকরা গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন। গোলকোন্ডার সুলতান মসুলিপটনম দখল করে সেটিকে সুলতানী রাজ্যটির প্রধান সমুদ্রদ্বার হিসাবে গড়ে তুললে তাঁদের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। মুঘল পক্ষে যোগ দেওয়ার আগে গোলকোন্ডার অভিজাত ও পারসীক বংশোদ্ভুত মীর জুমলা ১৬৪০ এবং ১৬৫০-এর দশকে মসুলিপটনমের বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাঁরা (পারসীকরা) ফরাসী বণিকদের উদ্ধার করেন এবং স্থানীয় হাবিলদারের হাত থেকে তাঁদের রক্ষা করেন।[১২] আয়ুথিয়া উপকূলে ইরানীরা প্রভূত রাজনৈতিক প্রভাবের অধিকারী হয়েছিলেন।[১৩]

(৩)

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সামুদ্রিক বাণিজ্যে ভারতের একদল খ্রিস্টান বণিকও যুক্ত ছিলেন। তাঁদের কিছু ছিলেন ভারতীয়, কিছু মিশ্র বংশোদ্ভুত এবং কিছু বিদেশী বংশোদ্ভুত। ভারতীয় বংশোদ্ভুত খ্রিস্টানদের মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায় ছিল। এর মধ্যে সিরীয় খ্রিস্টানরা পর্তুগীজদের আগেই এসেছিলেন। তাঁদের ঘাঁটি ছিল পূর্ব তটে মাদ্রাজের নিকটে সান তোম। তাঁরা পর্তুগীজ বণিক এবং স্থানীয় যোগানদারদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতেন এবং মালাবার উপকূলে পর্তুগীজদের মশলা যোগান দিতেন।

অন্য খ্রিস্টিয় সম্প্রদায়টি ছিল দক্ষিণ করমণ্ডলের পারাভা মৎস্যজীবী সম্প্রদায়। পর্তুগীজরা এদেশে এসে মিশনারিদের সাহায্যে ধর্মপ্রচার শুরু করলে এঁরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। মৎস্যশিকারের সঙ্গে তাঁরা মান্নার উপসাগরে মুক্তোও সংগ্রহ করতেন। ক্রমান্বয়ে তাঁরা ছোট ব্যবসায়ীতে পরিণত হন এবং পর্তুগীজ জাহাজে নানা কাজে নিযুক্ত হন।

বহু পর্তুগীজ যাঁরা এস্তাদো'র (Estado) কর্মী ছিলেন না অথবা যাঁরা পর্তুগীজ-রাজ্য থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা স্বাধীন নাগরিক বা কাসাদো-য় (casado) পরিণত হলেন। তাঁদের স্বাধীনভাবে ভাগ্যান্বেষণের সুযোগ ছিল। করমণ্ডল উপকূলকে সম্ভবনাপূর্ণ ক্ষেত্র মনে করে তাঁরা সান তোমে বসবাস শুরু করেন এবং সামুদ্রিক বাণিজ্য চালিয়ে যান। তাঁদের কাজকর্মের প্রধান ক্ষেত্র ছিল দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য। তাঁরা স্বাধীনভাবে বা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতেন। মিশ্র ইন্দো-পর্তুগীজ বংশোদ্ভুত মেস্টিকোরাও (mestico) তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। তাঁরা নানাবিধ কাজ করতেন এবং নানা দিকে পাড়ি দেওয়া জাহাজের কাজে নিযুক্ত হতেন।

ইংরেজরা মাদ্রাজ দখল করে নিলে এবং ওলন্দাজরা তাঁদের (পর্তুগীজদের) নেগাপটনম থেকে দক্ষিণদিকে তাড়িয়ে দিলেও কিছু 'পর্তুগীজ' রয়ে যান 'বন্দর এলাকার শ্রমিক, সেনাছাউনির সৈনিক এবং খাদ্যসরবরাহকারী হিসাবে, যার মধ্যে প্রধান ছিল মৎস্যজীবী হিসাবে তাঁদের ভূমিকা।'[১১]

করমণ্ডল তটবর্তী এলাকায় বসবাসকারী এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য খ্রিস্টানরা এসেছিলেন ইউরোপের নানা অঞ্চল থেকে। এছাড়া ছিলেন বেশ কিছু আর্মেনীয়।

এই আর্মেনীয়রা এসেছিলেন ইস্পাহানে তাঁদের উপনিবেশ জুলফা এবং আর্মেনিয়া উভয় স্থান থেকেই। ফার্সী ভাষায় তাঁদের জ্ঞান অন্যান্য ইউরোপীয়দের দোভাষী হিসাবে কাজ করার সুযোগ এনে দিয়েছিল কিন্তু তাঁরা নিজেরাও বাণিজ্য করতেন এবং করমণ্ডল উপকূলের ম্যানিলা বাণিজ্যে খুবই সক্রিয় ছিলেন।

ভারতের পর্তুগীজ এলাকাগুলি থেকে আসা ধর্মান্তরিত ভারতীয় খ্রিস্টানরা (যাঁরা স্বাধীন হতে পেরেছিলেন) ওলন্দাজদের রাজধানী বাটাভিয়ায় মারদিকার্সের (Mardijkers) টোপাসরা (Topasses) নামে বাস করতে থাকেন। তাঁরা নগরপ্রাচীরের বাইরে বাস করতেন। ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের নিজস্ব মহল্লা গড়ে ওঠে।[১৮]

Scanned with CamScanner

(৪)

দক্ষিণপূর্ব এশীয় দেশগুলিতে আরেক দল ভারতীয় বাস করতেন। তাঁরা ছিলেন বিভিন্ন ইউরোপীয় কোম্পানির বা কোন ব্যক্তির ক্রীতদাস অথবা জলদস্যুদের দ্বারা বন্দী ও দক্ষিণপূর্ব এশীয় দেশগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া লোকজন।

আরাকান দেশীয়রা প্রায়শই বাংলার উপকূলে অভিযান করে স্থানীয় মানুষদের ধরে নিয়ে যেতেন। তাঁরা দাস হিসাবে বিক্রীত হতেন এবং তাঁদের দক্ষিণপূর্ব এশীয় দেশগুলিতে নিয়ে গিয়ে গৃহকর্মে অথবা জাহাজে মজুরের কাজ করান হত।

ভারতে প্রধানত দুর্ভিক্ষের সময় দাসদের ধরা হত। দুর্ভিক্ষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল উজাড় করে দিত। সুতরাং দাসদের সংখ্যা কখনই খুব বেশী হত না।

দাস রপ্তানী বৃদ্ধি পায় সপ্তদশ শতকের ওলন্দাজদের চাহিদার ফলে। দুর্গনির্মাণ উপনিবেশ স্থাপন, বাগিচা চাষে শ্রমের যোগান দেওয়া প্রভৃতির জন্য তাদের শস্তা শ্রমের প্রয়োজন ছিল।[১৯]

ওলন্দাজরা বাংলা, উড়িষ্যা, গোদাবরী বদ্বীপ, চেঙ্গেলপুট / উত্তর আর্কট জেলা, তাঞ্জাভুর এবং মাদুরায় দাস কিনতেন।

ওলন্দাজরা প্রথম থেকেই ভারত থেকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় দাসরপ্তানীতে আগ্রহী ছিলেন। ১৬২০-এর দশকে ওলন্দাজরা করমণ্ডল উপকূল থেকে দাস রপ্তানী শুরু করেন। কিছু ভারতীয়ও দাস বিক্রয় করতেন।[২০] দাসদের কায়িক শ্রমের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেল যখন VOC গোলমরিচের বাগিচা স্থাপন করল এবং সুমাত্রার পশ্চিম তটে স্বর্ণখনির কাজ শুরু করল।[২১] ১৬২২ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজরা করমণ্ডল উপকূলে এক হাজার দাস ক্রয় করেন এবং তাদের বাটাভিয়া পাঠান।[২২] ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুবেদার মহম্মদ সুজা অভিযোগ করেন যে ওলন্দাজরা বছরে '৫০০০ থেকে ৬০০০ জন আরাকানীদের হাতে বন্দী বাঙালীকে বাটাভিয়ায় দাস হিসাবে প্রেরণ করেন'।[২৩]

কিছু দাসকে অরবইনা, বান্দা দ্বীপের জায়ফল বাগিচায় কাজের জন্য অথবা 'ওলন্দাজ কুঠিয়ালদের ঘরোয়া কাজের জন্য' পাঠান হত।[২৪] ওলন্দাজরা ২০৫ জন দাসকে মালাক্কায় পাঠান যারা 'বিভিন্ন ধরনের শহুরে কাজে' নিযুক্ত হতেন।[২৫] ১৬২২ সালে কেন (Coen) লিখেছিলেন, ''তাঁরা (দাসরা) কাপড়ের ব্যবসার থেকে বেশী লাভজনক....''[২৬] ১৬২৩ সালে ১১২৩ জন এবং ১৬২৪ সালে ৯২৮ জন দাসকে পাঠান হয়েছিল।[২৭]

১৬৮৫-৮৭ সালে নানা কারণে অনাহারের ঘটনা ঘটে। ১৬৮৫-৮৬ সালে

অনাবৃষ্টির জন্য শস্যহানি ঘটে। নিম্ন অন্ধ্র অঞ্চলে ওলাওঠা মহামারীর আকার ধারণ করে, কর্মক্ষম জনসাধারণের বিনাশ ঘটে। মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধও স্থানীয় অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে। ফলস্বরূপ সাধারণ মানুষ নিজেদের দাস হিসাবে বেচে দেন এবং দাসের বাজার খুব তেজী হয়ে ওঠে।[২৮]

অধ্যাপক আরসরত্নম বলেছেন যে মসুলিপটনম, নেগাপটনম এবং পোর্টো নোভো'র কিছু হিন্দু ও মুসলিম বণিক নিয়মিত আচে রাজ্যে দাস পাঠাতেন। আচে'র সুলতান ইস্কান্দার মুদা (১৬০৭-৩৬) শ্রমশক্তির অভাব সামাল দিতে দাস আমদানীতে উৎসাহ দিতেন।[২৯]

করমণ্ডল উপকূল থেকে দাস রপ্তানী অনিয়মিত ভাবে চলত। 'করমণ্ডল থেকে দাস রপ্তানীতে.....চল্লিশের দশকে তেজী ভাব এসেছিল'। ওলন্দাজরা চেষ্টা করেন 'কৃষ্ণাপ্পাকে প্রভাবিত করে প্রতিবছর জিঞ্জি থেকে ৮০০ থেকে ১০০০ জন দাস কেনার অনুমতি লাভ করতে....', কিন্তু তাঁরা বিফল হন কেননা দাস ব্যবসা 'ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এক বিরাট অপরাধ'। তবে করমণ্ডল ও বাংলা থেকে দাস রপ্তানী চলতে থাকে, কিন্তু তাঁদের সংখ্যায় হেরফের ঘটত কেননা প্রধানত দুর্ভিক্ষের সময়েই তাঁদের পাওয়া যেত।[৩০]

নেগাপটনম থেকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় দাস পাঠান হত। নায়করা এই প্রথাকে উৎসাহ দিতেন কারণ দাস রপ্তানীর ওপর শুল্ক চাপান হত এবং সেই শুল্ক থেকে তাঞ্জোরের নায়কদের আয় হত।[৩১]

কিছু দাস দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ধনী পর্তুগীজ বণিকদের গৃহে কাজ পেতেন। মেয়েদের রক্ষিতা করে রাখা হত।[৩২] বহু দাস গৃহভৃত্যের কাজ করতেন।[৩৩] তাঁদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমরা ধারণা করতে পারি মাত্র। ক্রমান্বয়ে তাঁরা স্থানীয় জনসাধারণের অংশ হয়ে যেতেন।

(৫)

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্য করতে যেতে ভারতীয়রা কেন উৎসাহিত বোধ করতেন? এর উত্তরে বলা যায় নতুন ডাঙার আকর্ষণ আর ঘর ছাড়ার তাগিদ দুটোই সমানভাবে কাজ করত।

সহজ উত্তরটি হল লাভের আশায় তাঁরা যেতেন। ভারত থেকে রপ্তানীকৃত দ্রব্যের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পণ্য ছিল সূতীবস্ত্র। মালাবার ও কন্নড় বাদ দিয়ে ভারতের পশ্চিম তটের সর্বত্র এবং পূর্ব-ভারতে করমণ্ডল থেকে বাংলা অবধি সর্বত্র সূতীবস্ত্র

Scanned with CamScanner

তৈরী হত। স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে সেগুলি রপ্তানী করা হত। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার নীচু থেকে অভিজাত স্তরের মানুষদের চাহিদা অনুযায়ী নকশা রং, কারুকার্য ও গুণমান অনুসারে ভারতীয় সূতীবস্ত্র প্রয়োজন মেটাত। যেমন, পুলিকটের কাপড়কে পর্তুগীজরা বলতেন পিস্টাডোস এবং সেগুলি মলুক্কাসে খুবই জনপ্রিয় ছিল।[২৪] ১৬১২ সালে শ্যামদেশের জনৈক ওলন্দাজ কুঠিয়াল হেনড্রিক ক্রয়ের লিখেছিলেন, 'করমণ্ডল উপকূল মলুক্কাসের বাম হস্তস্বরূপ কারণ আমরা লক্ষ্য করেছি যে করমণ্ডলের বস্ত্র বিনা মলুক্কাসের বাণিজ্য মৃতবৎ।'[২৫] মালাক্কা থেকে মলুক্কাস অবধি গুজরাতি বস্ত্র খুবই ভালভাবে বিক্রয় হত।[২৬] এই চাহিদা মেটানর সক্ষমতা ভারতীয় বস্ত্রের চালু ও নিয়মিত জোগানকে সুনিশ্চিত করেছিল।

চাল ছিল আরেকটি গুরত্বপূর্ণ দ্রব্য যা দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ভারত থেকে পেত। বন্দর শহরগুলিতে জনসাধারণের জন্য যথেষ্ট খাদ্য মজুত থাকত না। তাঁরা বঙ্গোপসাগরের তটবর্তী অঞ্চল অর্থাৎ বাংলা, উড়িষ্যা ও করমণ্ডল উপকূলসহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে চাল আমদানী করত। বাইরের চালের ওপর বন্দর রাষ্ট্রগুলির নির্ভরতা একটি ঘটনা থেকে বোঝা যায়। ১৬৪০-৪১ সালে VOC মালাক্কা অবরোধ করে। সাতমাস প্রতিরোধের পর পর্তুগীজরা আত্মসমর্পণ করেন কারণ অধিবাসীরা এতই রুগ্ন হয়ে পড়েছিলেন যে মায়েরা খিদের তাড়নায় নিজেদের বাচ্চাদের কবর খুঁড়ে বার করে নেন।[২৭]

১৫৯১ খ্রিস্টাব্দে মসুলিপটনমের শাসক মালাক্কার পর্তুগীজদের পত্র লেখেন যে প্রতি বছর দুটি জাহাজ চলাচলের অনুমতি পত্র পেলে তার পরিবর্তে তিনি চাল পাঠাবেন। পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে যান।[২৮]

বাংলা, উড়িষ্যার মহানদী বদ্বীপ, অন্দ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা বদ্বীপ এবং তামিলনাড়ুর কাবেরী বদ্বীপ ছিল ধানের গোলা এবং সেখান থেকে নিয়মিত ভারতের অভ্যন্তরে এবং ভারতের বাইরে সিংহল থেকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় চাল রপ্তানী হত। বুশোঁ'র মতে কাপড়ের তুলনায় চাল-ই মশলা সংগ্রহের জন্য বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল।[২৯]

এর পরিবর্তে ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক বাজারে বিক্রি করার জন্য নানাবিধ সামগ্রী নিয়ে আসতেন ভারতীয়রা। যেমন, বাংলায় সব ধরণের মশলার বাজার ছিল, যেগুলি দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত গঙ্গা-যমুনা অববাহিকায় বাজারের চাহিদা মেটাত।

বাংলা, উড়িষ্যা ও করমণ্ডল উপকূলে হাতিও সহজে বিক্রয় হয়ে যেত। ললাটেন্দু দাস মহাপাত্রের প্রদত্ত উপাত্ত অনুসারে ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মে অবধি তেনাসেরিম, আচিন, পেগু, কোচিন চীন, আরাকান ও

কোরুঞ্জা থেকে জাহাজে করে বালাসোরে হাতি এসেছিল। জাহাজগুলির মালিক ছিলেন শ্যামের রাজা, দু'জন ওড়িয়া বণিক খেম চাঁদ ও চিন্তামন শাহ, শায়েস্তা খান এবং জনৈক অজ্ঞাতপরিচয় মুসলিম।

অন্য আরেকটি সারণীতে মহাপাত্র দেখিয়েছেন যে ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দের ৬ মে থেকে ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাস অবধি দু'জন ওড়িয়া বণিক খেম চাঁদ ও চিন্তামন শাহ তেনাসেরিম ও আচিন থেকে ৬৩টি এবং সিংহলের জাফনাপটনম ও গল থেকে ৪১টি হাতি আমদানী করেন।[৩০]

মালয়ের কেডা ছিল হাতির যোগানের অন্যতম উৎস।[৩১]

ওলন্দাজরা সিংহল দখল করলে ভারতে হাতির যোগানের অন্যতম উৎস বিঘ্নিত হয়। বাংলার বণিকরা হাতি আমদানীর জন্য কেডা ও আরাকানের ওপর নির্ভর করতে শুরু করেন এবং ওলন্দাজরা বাধ্য হন ভারতে হাতি রপ্তানীর ওপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করতে।[৩২]

হাতির ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক ছিল। কেডায় ২০০ স্প্যানিশ রিয়ালে কেনা একটি হাতি মসুলিপটনম বা বাংলায় ৩,০০০ রিয়ালে বিক্রি হত—কেনা দামের ১৫ গুণ বেশী দামে।[৩৩]

মহার্ঘ মশলা যেমন জায়ফল, জৈত্রী এবং ভেষজ উদ্ভিদ যেমন কর্পূর ও চন্দন কাঠের বাজার ছিল ভারতের সর্বত্র।

শেষে বলা যায় যে সুমাত্রা ও মালয়ে সোনা কেনা হত এবং ব্রহ্মদেশ থেকে আমদানী করা হত দামী রত্ন বিশেষত চুনি।[৩৪]

ভারতীয়রা চীনা মাটির দ্রব্যও কিনতেন। ভারতে এবং পারসীক-আরব জগতে এটি প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হত।

একজন ভারতীয় বণিক দক্ষিণপূর্ব এশিয়া থেকে আমদানীযোগ্য এবং নিজের দেশে সর্বদা চাহিদা রয়েছে এমন কোন না কোন মহার্ঘ পণ্য সব সময়েই খুঁজে পেয়ে যেতেন।

(৬)

করমণ্ডল উপকূলের ভারতীয়দের জন্য দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বাণিজ্য যথেষ্ট আকর্ষণীয় ছিল কেননা হিন্দুদের কাছে আরব সাগরের উত্তর ও পশ্চিম তীরবর্তী দেশগুলির তুলনায় দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় পরিস্থিতি বেশী অনুকূল ছিল।

Scanned with CamScanner

সপ্তদশ শতকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় আংশিকভাবে ইসলামীকরণ ঘটেছিল। ব্রহ্মদেশ ও শ্যাম ছিল বৌদ্ধ মতাবলম্বী। মালয়ের তটবর্তী অঞ্চলে ইসলামের প্রসার ঘটে; ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। নবদীক্ষিতরা তাদের হিন্দু-বৌদ্ধ ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেন নি। অনেক মন্দির তখনও অক্ষত ছিল; স্থানীয় মানুষজন ইসলামে দীক্ষিত হলেও হিন্দু নাম গ্রহণ করতেন। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ হিন্দুদের পক্ষে প্রতিকূল হয় নি।[১৫] পূর্ব যবদ্বীপের চন্ডী পনতরন মন্দির এলাকাটি ঘুরে জনৈক লেখক দেখেছেন যে সেখানকার একটি অনুশাসন অনুযায়ী জ্যেষ্ঠা ভগ্নী সুহিতা'র (১৪২৯-৪৭) পর রাজা কের্তবিজয় (১৪৪৭-৫১) সিংহাসনে আরোহন করেন। কের্তবিজয়ের নামের ঠিক পরেই তাঁর রাণী দহ'র রাজকুমারী দীয়া জয়েশ্বরী'র নাম রয়েছে, যাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে এই ভাবে, 'তিনি হলেন পর্বতকন্যার (অর্থাৎ উমা) জীবন্ত প্রতিমূর্তি, তার তনু রচনা করেছেন লোকেশ (লোকেশ্বর), কেশব ও মহেশ্বর (অর্থাৎ বুদ্ধ, বিষ্ণু ও শিব), মানবজাতির সমৃদ্ধি ও আনন্দবর্ধনার্থে তিনি যবদ্বীপাধিপতির (*Xavesrasya*) আলিঙ্গনে বদ্ধ'।[১৬] হিন্দুদের মনে হত না যে তাঁরা কোন বিরূপ সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বাতাবরণে বাস করছেন।

রাজনৈতিক পরিস্থিতিও মিত্রতার উপযোগী ছিল। মালয় বা ইন্দোনেশিয়াতে কোন বৃহদাকার রাজ্য ছিল না। আয়বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি বাণিজ্যে উৎসাহ দিত। ভারতীয়রা নবাগত ইংরেজ বা ওলন্দাজদের মত তত দখলদারির মনোভাব নিয়ে চলতেন না বলে ইউরোপীয় প্রভাবকে প্রতিহত করতে তাঁরা স্থানীয় ভাবে সমাদৃত হতেন।

হিন্দু বণিক একাধারে সরাফও ছিলেন। তিনি ঋণ দিতেন, হুন্ডি চালাতেন এবং স্থানীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিলেন। তিনি গ্রহণযোগ্য ছিলেন।[১৭]

সুতরাং স্থানীয় কোন কারণে সপ্তদশ শতকে ভারতীয় হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টান বণিকদের দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় অভিবাসন বাধাপ্রাপ্ত হয় নি।

করমণ্ডলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বণিকদের দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় পাড়ি দিতে তাগিদ যোগাত। কৃষ্ণদেব রায়ার মৃত্যুর পর বিজয়নগরের পতন ঘটলে পঞ্চদশ শতকে এই উপকূলবর্তী অঞ্চলটি নায়কদের অধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।[১৮] এই নায়করা, যাঁদের মধ্যে অনেক কন্নড় ও তেলুগুভাষী ছিলেন, তাঁরা নিজস্ব আয়বৃদ্ধির জন্য বাণিজ্য ও কারিগরীতে উৎসাহ দিতেন।[১৯] তাঞ্জাভুর বদ্বীপে নানান জাত ও পেশার মানুষ যৌথভাবে এই প্রক্রিয়াটিতে মদত যোগাতেন ও তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতেন। তাঁরা তাঁতীদের এখানে এনে বসবাস করান এবং রপ্তানীর জন্য কাপড় তৈরী হতে থাকে। স্থানীয় বণিকরা সেগুলিকে দক্ষিণপূর্ব এশীয় দেশগুলির তটবর্তী অঞ্চলে নিয়ে যেতেন। দক্ষিণপূর্ব এশিয়াস্থ করমণ্ডলের চেট্টিরা ছিলেন একটি বহুভাষী এবং বিভিন্ন জাতের মানুষদের নিয়ে তৈরী হওয়া গোষ্ঠী।

(৭)

আমরা এবার ভারতীয় বণিকদের কাজকর্মের দিকে মনোনিবেশ করব। সুবিধার জন্য আমরা সমগ্র অঞ্চলটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিলাম ঃ ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ, মশলা দ্বীপ (Spice Islands) এবং শ্যাম।

'ক্লিঙ্', 'চুলিয়া' এবং অন্যান্য ভারতীয় বণিকদের কাছে ব্রহ্মদেশের তটভূমি ছিল প্রথম অবতরণভূমি। এই তটের তিনটি প্রধান বিভাগ আছে ঃ আরাকান, পেগু ও তেনাসেরিম। আরাকান তার চট্টগ্রাম বন্দরের সাহায্যে বাংলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে। আরাকানীরা নিয়মিত বাংলার বদ্বীপ অঞ্চলে হানা দিয়ে দাসদের ধরে নিয়ে যেতেন।

পেগু, মার্তবান এবং সিরিয়াম বহুমূল্য রত্নের জন্য ভারতীয়দের আকৃষ্ট করত। আভা নদীর জলপথে আগত চীনা বণিকদের কাছ থেকে তাঁরা চীনা দ্রব্য কিনতেন।[২০] তেনাসেরিম ও মারগুই শ্যামদেশ ও তার প্রধান বন্দর আয়ুথিয়া'র প্রবেশদ্বার হিসাবে কাজ করত। এই স্থান দিয়ে ভারতীয়রা মালয়ের পূর্ব উপকূলে পট্টনি নামক বড় বন্দরটিতে যেতে পারতেন।

মারগুই ও তেনাসেরিম ভারতীয়দের শ্যামদেশীয় হাতি ও চীনা পণ্য কেনার সুযোগ করে দিত। এই দুটি স্থান শ্যামদেশে রপ্তানীকৃত ভারতীয় চামড়ার যানবদলের স্থানও ছিল।

সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে নিম্ন ব্রহ্ম অঞ্চলের বাণিজ্যকে নেগাপটনমের মারাইক্কায়ার মুসলমানরা প্রধানত নিয়ন্ত্রণ করতেন। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মারাইক্কায়ার বণিক ছিলেন কুন্‌জ্ আলি যাঁর বার্ষিক বাণিজ্যিক লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৮০,০০০ থেকে ১,০০,০০০ পারদৌ।[২১]

সিরিয়ামে সোনাও পাওয়া যেত।[২২] ১৬৩০-এর দশকের শেষদিকে প্রচুর পরিমাণে ভারতীয় বস্ত্র আমদানীর ফলে ওলন্দাজ বাণিজ্যে ভাঁটা আসে।[২৩] এখানে ওলন্দাজরা হুন্ডি জোগাড় করতেন, যেগুলি করমণ্ডল উপকূলে ভাঙিয়ে তাঁদের নগদভাণ্ডার স্ফীত হত। সিরিয়ামের ভারতীয় বণিকরা ব্যাংকিং ব্যবসাও চালাতেন। ১৬৪৭ সালে ভারতীয় এবং তাঁদের সহযোগী পর্তুগীজদের অত্যধিক পরিমাণ কাপড়ের আমদানী

Scanned with CamScanner

অতি সঞ্চয়ের (glut) সৃষ্টি করে যার ফলে ওলন্দাজদের লাভের আশা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।[২৪] অন্যভাবে বলা যায় যে, পেগু ও করমণ্ডল উপকূলের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সংযোগ যথেষ্ট সংখ্যক ভারতীয়কে তেনাসেরিম ও সিরিয়ামে নিয়ে এসেছিল।[২৫]

নেগাপটনমের মুসলমান বণিকরাও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় সক্রিয় ছিলেন। ১৬২৫ সালে তাঁরা আচেতে দুটি, কেডায় একটি এবং পেগুতে একটি জাহাজ পাঠান।[২৬]

ওলন্দাজরা বুঝতে পেরেছিলেন যে নেগাপটনম ও করমণ্ডলের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত বণিকরা তাঁদের দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সর্বত্র এবং ম্যাকাসারের মশলার বাণিজ্য ও মালয়ের টিনের বাণিজ্যের স্বার্থের পক্ষে হানিকারক।[২৭] পরবর্তী উদাহরণগুলি থেকে এই বাণিজ্যের বর্ধিষ্ণু অবস্থা পরিষ্কার বোঝা যাবে। করমণ্ডলের একজন গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্যতম ধনী বণিক মলয় চেট্টি ১৬৩৪ সালে নিজের জাহাজ পাঠান আরাকান, পেগু ও তেনাসেরিমে।[২৮] মলয় চেট্টির মৃত্যুর পর তাঁর ভাই চিন্নানি দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং তিনিও বৃহৎ বণিক ও জাহাজমালিক হিসাবে সমধিক খ্যাত হন। মুকুন্দ লিখেছেন যে, 'জাহাজমালিক ও রপ্তানীকারক হিসাবে তাঁর বাণিজ্য সম্ভবত তাঁর প্রয়াত ভ্রাতা মলয়ের তুলনায় অধিক ছিল।'[২৯] VOC-র সঙ্গে তাঁর সংযোগ এতই ঘনিষ্ঠ ছিল যে ১৬৫৮ সালে ওলন্দাজরা তাঁদের হয়ে তাঁকে তাঞ্জাভুরের নায়কের সঙ্গে আলোচনা করতে বলেন।[৩০]

করমণ্ডল উপকূলের প্রভাবশালী এইসব ভারতীয় বণিকরা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বাজারে কর্মরত স্বদেশীয়দের সহযোগিতায় জিনিস বেচতেন এবং ফিরতি পথে অন্যান্য পণ্য নিয়ে আসতেন।

সময় যত এগিয়েছে ওলন্দাজরা চেষ্টা করেছেন ভারতীয়দের প্রতিযোগিতাকে নির্মূল করতে। ভারতীয় বণিক-জনগোষ্ঠী তখন ক্রমবর্ধিষ্ণু এবং এশীয় বা ইউরোপীয় কোন প্রতিযোগীর পক্ষেই তাকে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব ছিল না।

(৮)

নেগাপটনম থেকে যেহেতু দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্যের বিস্তার ঘটেছিল তাই এখন তার প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করতে পারি।

১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজরা যখন মালাক্কাগামী সান্তো আন্তনিও জাহাজটি দখল করে তখন তাতে ৮০০ জন লোক ছিলেন।[৩১] এর থেকে বোঝা যায় যে ভারতীয় বন্দর ও দক্ষিণপূর্ব এশীয় বন্দরগুলির মধ্যে যাতায়াতের ক্ষেত্রে ভারতীয় যাত্রীরা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজরা মালাক্কা দখল করলে তার সঙ্গে নেগাপটনম ও মসুলিপটনমের বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়।[৩২] ফলে এই দুটি বন্দর মালাক্কা প্রণালীতে অবস্থিত অথচ পর্তুগীজ নিয়ন্ত্রণাধীন নয় এমন একটি বন্দর আচে'র সঙ্গে বাণিজ্য শুরু করে। পর্তুগীজদের মালাক্কা দখলের পরিণতিতে বিতাড়িত মুসলিম বণিকরা সেখানে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন।

১৬২০-র দশকে এখানকার খ্রিস্টান সম্প্রদায়, যাদের বেশীরভাগই ছিলেন পর্তুগীজ কাসাদো, তাঁরা ম্যানিলার সঙ্গে বাণিজ্য শুরু করেন।[৩৪] ১৫৭০-এর দশকে পর্তুগালের রাজা এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে নিজস্ব জাহাজ পাঠান বন্ধ করে দিলে পর্তুগীজ শাসকশ্রেণী বিশেষ ছাড় দিয়ে কিছু জাহাজ চালানর অনুমতি দেন (Concession Voyage)। পর্তুগীজ নাগরিকদের ঐ অঞ্চলগুলিতে জাহাজ পাঠানর অনুমতি দেওয়া হয়।

বাণিজ্যের প্রয়োজনে নেগাপটনমের কাসাদোরা, প্রায়শই দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় যেতেন। তাঁদের দেখা যেত উজানসেলাঙ, ট্র্যাঙ, বাঙ্গেরি, কেডা, মার্তবান, মারগুই, আচে, মালাক্কা, ম্যাকাসর, ম্যানিলা প্রভৃতি অঞ্চলে। মালাক্কায় করমণ্ডল থেকে অভিবাসন করা জনৈক হিন্দু বণিকের গৃহের অঙ্গনে একটি ক্রস দেখে বোঝা যায় যে এই অঞ্চল (করমণ্ডল) থেকে খ্রিস্টানরাও মালাক্কায় গিয়েছিলেন।[৩৫] ১৬২০-র দশকে জনৈক খ্রিস্টান বণিক কার্যত নিজের ক্ষুদ্র বাণিজ্য সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। ম্যাকাসর অবধি এলাকা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৩৬]

নেগাপটনম তাঞ্জোরের নায়কের অধীনে থাকলেও ১৬৪৩ সাল নাগাদ কার্যত কাসাদোদের অধীন হয়ে পড়েছিল।[৩৭] ১৬৪৮-৪৯ এবং ১৬৪৯-৫০ সালে যথাক্রমে ছয়টি এবং পাঁচটি জাহাজ ম্যাকাসর, আচে, মারগুই ও পেগুতে গিয়েছিল।[৩৮]

তবে ১৬৫২ সালে ওলন্দাজদের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হলে এর ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। ১৬৫৮ সালের ২০ জুলাই ওলন্দাজরা নেগাপটনম দখল করে নেন। কাসাদোরা কয়েক মাইল উত্তরে পোর্টো নোভোতে পালিয়ে যান এবং যাঁরা পালান নি তাঁরা ওলন্দাজদের দালালে পরিণত হন।[৩৯]

পোর্টো নোভা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সঙ্গে নিজস্ব সামুদ্রিক বাণিজ্য সংযোগ গড়ে তোলে। ১৬৮০ সালের মধ্যেই এটি মাদ্রাজের দক্ষিণে অবস্থিত করমণ্ডলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বন্দরে পরিণত হয়।[৪০] ১৬৮১ থেকে ১৬৮৬ সালের মধ্যে পোর্টো নোভো থেকে পেগু, আচে ও মালাক্কা বন্দরের বেশ কিছু জাহাজে রওনা দেয়।[৪১] সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বণিক ছিলেন মানুয়েল তেহিরা পিন্টো। তিনি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় একটি ক্ষুদ্রাবয়ব বাণিজ্য-সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।

Scanned with CamScanner

অন্যভাবে বলা চলে নেগাপটনমের সঙ্গে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বাণিজ্য অব্যাহত ছিল, তবে এতে ওলন্দাজদের উপস্থিতি ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছিল।

এরপর নেগাপটনম মালাক্কার সঙ্গে নিয়মিত বাণিজ্য করতে থাকে, মালাক্কা ইতিমধ্যেই ওলন্দাজদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিল। স্থানীয় জনতার ভরণপোষণের জন্য ওলন্দাজরা নেগাপটনমের কাছ থেকে চাল আমদানী করেছিল।[৭২]

১৬৩০-এর দশকে নেগাপটনমের একজন খ্যাতনামা পর্তুগীজ বণিক ছিলেন ফ্রান্সিসকো ভিইরা দা ফিগেইরাদো। তিনি ম্যাকাসর ও ক্ষুদ্র সুন্দা দ্বীপপুঞ্জে চলে গিয়ে 'জেন্তিলে' বা অ-মুসলিম, অ-খ্রিস্টান (অর্থাৎ প্রধানত বৌদ্ধ ও হিন্দু) বণিকদের সঙ্গে বাণিজ্য করতেন। ম্যানিলা ও মালাক্কার সঙ্গে তাঁর বিস্তৃত বাণিজ্যিক সংযোগ ছিল।[৭৩]

সপ্তদশ শতকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ানিবাসী ভারতীয়রা, যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন বণিক, তাঁরা অস্তিত্বের সংকটে পড়েন, বিশেষভাবে ওলন্দাজদের কার্যকলাপের জন্য।

১৬৩৯ সালে করমণ্ডলের বণিকরা তেনাসেরিম, কেডা, আচিন ও সংলগ্ন বাজারগুলিতে বস্ত্রসামগ্রী সহ ভিড় জমাতেন।[৭৪] এর ফলে চরম ক্ষুব্ধ ওলন্দাজরা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হন।

১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজরা তাঁদের কুঠিয়ালদের প্রতি নির্দেশ জারী করেন যাতে আচিন, মালাক্কা এবং পেরাক, কেডা ও উজানসেলাঙ্ (জাংক-সিলোন) - এর 'টিন ক্ষেত্র' অভিমুখে যাত্রা করা ভারতীয় জাহাজগুলিকে অনুমতি পত্র না দেওয়া হয়। এই আদেশ কখনই পুরোপুরি কার্যকর হয় নি। গোলকোন্ডার প্রধানমন্ত্রী তথা একজন প্রধান বণিক মীর জুমলা ওলন্দাজদের উপেক্ষা করে ১৬৪৯ সালে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় জাহাজ পাঠান।[৭৫]

ওলন্দাজদের হুকুম উপেক্ষা করে নেগাপটনমের বণিকরা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় জাহাজ পাঠিয়েছিলেন।[৭৬] বাংলার ওলন্দাজ কুঠিয়ালরা উপরওয়ালাদের আদেশ অগ্রাহ্য করে বাংলার বণিকদের দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় জাহাজ পাঠানোর অনুমতিপত্র দেন। শেষপর্যন্ত ১৬৫১ সালে ওলন্দাজরা তাঁদের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন।[৭৭]

ওলন্দাজরা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৬৪১ সালে তাঁরা মালাক্কা দখল করেন। আচিনের শাসক ওলন্দাজদের মালাক্কা আক্রমণে সহায়তা করেন।[৭৮] তাঁরা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সামুদ্রিক বাণিজ্যে সক্রিয় করমণ্ডলের প্রধান বন্দর নেগাপটনমও ১৬৫৮ সালে দখল করে নেন।[৭৯]

ওলন্দাজরা মালয়ের বন্দরগুলিতে ভারতীয়দের ব্যবসা না করতে দেওয়ার জন্য আরও কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ওলন্দাজ ভিন্ন অন্য জাহাজে মালাক্কায় আনীত বস্ত্রসামগ্রীর উপর তার মূল্যের দশ শতাংশ শুল্ক হিসাবে চাপান হত, যেখানে ওলন্দাজ জাহাজে আনীত পণ্যের উপর শুল্ক চাপান হত আড়াই শতাংশ। ওলন্দাজ ভিন্ন অন্য সব জাহাজকে তাঁদের পূর্বানুমতি নেওয়ার আদেশ জারী করেন ওলন্দাজরা। ভারতীয় বস্ত্রসামগ্রীর বিক্রেতা দোকান-মালিকদের প্রতিমাসে দুই গিল্ডার লাইসেন্স ফি হিসাবে দিতে হত, অপর দিকে VOC কোম্পানির বস্ত্রবিক্রেতাদের দিতে হত মাসিক এক গিল্ডার। ভারতীয় জাহাজের গতিরোধ করার জন্য সমুদ্র প্রণালীগুলিতে ওলন্দাজ জাহাজগুলি টহল দিত।

মালয়ের বন্দরগুলিতে প্রবেশের পথ রুদ্ধ করার ওলন্দাজ প্রয়াস সফল হয় নি। ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে 'জনৈক ভারতীয় বণিক নবোব মামেট আমিনচান তাঁর তরণীতে পেরাক থেকে হাতি নিয়ে যান। সুরাটের মুসলিম জাহাজগুলি কেডার সঙ্গে সরাসরি টিনের ব্যবসা করত। বহু ভারতীয় জাহাজ ফরাসী, পর্তুগীজ ড্যানিশ বা ইংরেজ পতাকা উড়িয়ে ওলন্দাজদের অবরোধ এড়াত'।[৮০]

সুতরাং সপ্তদশ শতকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারতীয়দের অভিবাসন নিরন্তরভাবে চলেছিল। ষোড়শ শতকের পর্তুগীজদের মতই সপ্তদশ শতকে ওলন্দাজরা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারতীয়দের অভিবাসন ঠেকাতে পারে নি।

ইংরেজের ও ওলন্দাজদের অনুপ্রবেশের কয়েক শতক আগে থেকেই মালয় উপদ্বীপের উভয় পার্শ্বে এবং মালয়ের পূর্ব তটভূমি থেকে কিছু দূরে অবস্থিত দ্বীপগুলিতে ভারতীয়রা প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছিলেন। ভারতীয়রা বস্ত্রসামগ্রী নিয়ে যেতেন এবং নিয়ে আসতেন স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন টিন ও মশলা যার চাষ হত ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে। এছাড়া আনতেন ঐ অঞ্চলের নানা বাজারে উপলব্ধ চীনা সামগ্রী। তাঁদের কাজকর্মের কেন্দ্র ছিল মালাক্কা।

(৯)

ম্যাকাও থেকে পর্তুগীজরা মশলা দ্বীপ, ম্যাকাসর প্রভৃতি স্থানে আগমন শুরু করলে এই অঞ্চলগুলির বাণিজ্যের নকশা বদলে যায়। তাঁরা শ্যামের আয়ুথিয়াতেও এসেছিলেন।[৮১] তাঁরা যেমন সব ধরণের ভারতীয়দের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালান তেমনি তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতাও করেন। মধ্য-সপ্তদশ শতকে এই অঞ্চলে ইংরেজ জলদস্যুরা প্রবেশ করেন এবং তাঁরা আন্তঃ-এশীয় বাণিজ্যে নিযুক্ত অন্যান্য বণিকদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন।[৮২]

Scanned with CamScanner

ম্যাকাসরে কোচিন (ভারতের পশ্চিমতটে স্থিত), করমণ্ডল উপকূল, মালাক্কা, ম্যানিলা ও ম্যাকাও থেকে বণিকরা আসতেন।[১১] খুব সম্ভবত মালাক্কা থেকে বহু ভারতীয় বণিক এসেছিলেন যেখানে বিগত দুই শতক ধরে তাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং সেখান থেকে তাঁরা মশলা দ্বীপ থেকে প্রাপ্ত সামগ্রী যেমন চন্দন কাঠ, কর্পূর, জায়ফল ইত্যাদি নিয়ে আসতেন।

সুতরাং, বিস্ময়ের কিছু নেই যে স্যার হেনরি মিডলটন যখন মলুক্কা দ্বীপপুঞ্জের টারনেট অঞ্চলে গিয়েছিলেন সেখানে তিনি গুজরাতি বণিকদের ওলন্দাজ বণিকদের সঙ্গে কেনা জিনিসের দরদাম করতে দেখেছিলেন।[১২]

(১০)

মজাপহিতের আক্রমণে পলাতক পালেমবঙের রাজা প্রমেশ্বর আনুমানিক ১৪০০ খ্রিস্টাব্দে মালাক্কায় একটি বন্দর স্থাপন করেন। এটি ছিল একটি 'বিশুদ্ধ গঞ্জ' কারণ এর নিজের কোন উল্লেখযোগ্য উৎপাদিত দ্রব্য ছিল না।[১৩] দক্ষিণ মালয় উপদ্বীপ এবং সুমাত্রার মধ্য ও পূর্ব উপকূলের প্রধান জনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলিকে মালাক্কা নিয়ন্ত্রণ করত।[১৪] এশিয়ার বৃহত্তম স্বর্ণ বিক্রয়কেন্দ্র ছিল মালাক্কা কারণ শ্যামদেশ ও পটনি'র সোনা এখানে আসত। বোর্নিও থেকে আসত নিম্নমানের সোনা। সুমাত্রার মিনাঙ্কাবুতে একাধিক স্বর্ণখনি ছিল। প্রধানত এই জন্যই মালাক্কায় বসবাস করতে ভারতীয়রা প্রলুব্ধ হতেন এবং এখানে আসতেন।[১৫]

মালাক্কায় ভারতীয়রা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতেন এবং ব্যবসায়ী জনগোষ্ঠীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন ভারতের হিন্দু ও মুসলমান। হিন্দুরা নিজস্ব কাম্‌পোঙে বাস করতেন এবং মালাক্কার চারজন বন্দরের একজন ছিলেন করমণ্ডল উপকূল থেকে আগত জনৈক হিন্দু চেট্টি। ১৫১১ সালে পর্তুগীজ শাসক আলবুকার্ক মালাক্কা দখল করে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েম করলে অধিকাংশ এশীয় বণিকই পর্তুগীজ নিয়ন্ত্রণ এড়ানোর জন্য অন্যান্য বন্দরে ছড়িয়ে পড়েন।[১৬]

পর্তুগীজরা হিন্দু বণিকদের ক্ষতি করেন নি কারণ মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের সম্ভাব্য মিত্র হিসাবে ভাবা হত। হিন্দুরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পর্তুগীজদের সাহায্য করেন। মুসলমানরা আচেতে চলে যান। পর্তুগীজরা হিন্দু বণিক নানু চেট্টিকে পুরস্কৃত করেন, অপরদিকে মুসলমানদের প্রধান তিমুতা রাগা'র শিরচ্ছেদ করেন।[১৭] এর ফলে সুমাত্রা উপকূলে আচে'র উত্থান ঘটে, সেখানে মুসলমান বণিকরা যাঁদের মধ্যে গুজরাতিরাও ছিলেন, তাঁরা নিজেদের পুনর্বাসন করেন। মালাক্কার পর্তুগীজ-হিন্দু

মিত্রতা নানা উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে টিকে ছিল। ১৬০১ সালে পর্তুগীজ ক্যাপ্টেনরা হিন্দু বণিকদের সাহায্যকে কাজে লাগিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের কুঠিয়াল হিসাবে নিয়োগ করেন এবং তাঁদের কাছ থেকে টাকা ধার করেন।।[১৮]

পর্তুগীজ - হিন্দু মিত্রতা মালাক্কার অর্থনীতিতে হিন্দুদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে। সমসাময়িক একজন লেখকের মতে বছরে ৩০০টি জাহাজ মালাক্কায় পৌঁছত। 'প্রধানত ক্রিঙ্‌রা এসেছিলেন'। তাঁরা সাধারণত বস্ত্রসামগ্রী আনতেন সেটি পর্তুগীজ সরকারী বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।[১৯]

সাও তোম ও নেগাপটনমের খ্রিস্টানরা টিন আনতে পেরাক যেতেন। তাঁরা মালাক্কাকে এড়িয়ে চলতেন।[২০]

দেখা যাচ্ছে যে পর্তুগীজদের দ্বারা দখল হওয়ার পরেও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রধান বিপণনকেন্দ্র হিসাবে মালাক্কার স্থান অক্ষুন্ন ছিল। ক্রিঙ্‌রা অক্টোবরে আসতেন এবং জানুয়ারি পর্যন্ত সেখানে থেকে তারপর দেশের উদ্দেশে যাত্রা করতেন।[২১] মালাক্কা প্রণালী পেরনোর পথে জাহাজগুলি মালাক্কায় শুল্ক দিত। মালাক্কায় আমদানী-রপ্তানী শুল্ক থেকে লাভ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে করমণ্ডলের পর্তুগীজ অভিজাতদের ছাড়পত্রের জন্য শুল্ক না দিয়েই জাহাজ পাঠানোর অনুমতি দেওয়া হত, এগুলি বিশেষ ছাড়বিশিষ্ট যাত্রা (concession voyage) নামে পরিচিত ছিল। এই ছাড়ের আওতায় চীন, বাংলা, মার্তবান, কেডা, পাহাঙ্, পটনি, সুন্দা, ম্যাকাসর এবং বোর্নিওতে জাহাজ যেত।[২২] পর্তুগীজদের এই সিদ্ধান্ত দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সামুদ্রিক বাণিজ্যে উৎসাহের সঞ্চার করেছিল এবং ভারতীয়রা এইসব এলাকায় বাণিজ্যের জন্য যেতেন।

১৬০৫ সালে মালাক্কার দক্ষিণ জোহোরে গুজরাতিদের বস্ত্র বিক্রি করতে দেখা যেত।[২৩]

আর যে অতিরিক্ত কারণটি এইসব অঞ্চলে ভারত থেকে আগত অ-মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করেছিল তা হল মধ্য ও পূর্ব যবদ্বীপে তখনও হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজারা রাজত্ব করতেন।[২৪] ইসলামের প্রসার ঘটেছিল প্রধানত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে যেমন মালাক্কা প্রণালীতীরস্থ সুমাত্রার তটে, যবদ্বীপের উত্তর উপকূলে, ব্রুনেই, সুতা ও নালুকু অঞ্চলে।[২৫] পিরেসের বিবরণানুযায়ী চন্দন কাঠের জন্য বিখ্যাত তিমোর বা সান্ধে অঞ্চলেও ইসলামীকরণ ঘটেছিল।[২৬]

পর্তুগীজ ও হিন্দুদের মধ্যে ভাল সম্পর্কের জন্যই ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রায় ভারতীয়দের প্রসার ঘটে।[২৭]

Scanned with CamScanner

(১১)

মালাক্কায় পর্তুগীজদের অনুপ্রবেশ পর্তুগীজ ও মুসলমানদের মধ্যে প্রবল শত্রুতার জন্ম দিয়েছিল। মন কষাকষি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে পর্তুগীজরা যবদ্বীপের মুসলমান বন্দর-শহরগুলির সঙ্গে ব্যবসা করতেন না। তাঁরা তখনও পর্যন্ত ইসলামের প্রভাবমুক্ত পূর্ব যবদ্বীপের হিন্দু-বৌদ্ধ রাজাদের সঙ্গে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন।[১০০] এর ফলস্বরূপ পর্তুগীজরা ক্রমশ হিন্দু বণিকদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন এবং ঐ দ্বীপময় অঞ্চলে মুসলিমদের সঙ্গে বিবাদের কারণেই প্রধানত পর্তুগীজরা হিন্দুদের প্রতি সহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন।

পর্তুগীজ - মুসলিম বিরোধের জন্য ভারতীয় বণিকরা প্রধানত আচে'র দিকে সরে যান। ১৫৩০-এর দশকে ভারতীয়রা বিশেষত গুজরাতিরা আচে'র সঙ্গে এডেনের গোলমরিচের ব্যবসা গড়ে তোলেন। তাঁরা কাপড় আনতেন ও এডেনে গোলমরিচ নিয়ে যেতেন এবং গোলমরিচের বিনিময়ে মহার্ঘ ধাতু লাভ করতেন। ক্রমশ মালাক্কার পর্তুগীজদের সঙ্গে মুসলমানদের শত্রুতা বেড়ে উঠল।[১০১] ১৫৬৮ সালে আচে মালাক্কা আক্রমণ করলে কালিকটের মালাবারিরা আচে'র বাহিনীতে যোগ দেন।[১০২] আচে'র বাহিনী মালাক্কাগামী বাংলার ও পেগুর জাহাজকেও আক্রমণ করেন।[১০৩] মশলা দ্বীপের সঙ্গে পর্তুগীজদের সরকারী বাণিজ্যের যখন পতন ঘটল সে সময় থেকে কিছু পর্তুগীজ বণিক ব্যক্তিগতভাবে যবদ্বীপের মুসলমান-নিয়ন্ত্রিত বন্দরগুলিতে আসতে শুরু করলেন।

বণিক হিসাবে হিন্দুরা পর্তুগীজদের সমর্থনকে স্বাগত জানালেও তাঁরা আচে ত্যাগ করেন নি কারণ এর বর্ধিষ্ণু বাণিজ্যিক বাতাবরণ তাঁদের উত্তম লাভের অনেক বেশী সুযোগ করে দিয়েছিল।

পাসি ও পিডি'র গোলমরিচ উৎপাদন এলাকার উপর আচিন নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেছিল এবং পর্তুগীজদের গোলমরিচের প্রয়োজন মেটাতে পারত। মিনাঙ্কাবেনের স্বর্ণখনিগুলিকেও আচিন নিয়ন্ত্রণ করত।[১০৪] সুতরাং, আচে'র গোলমরিচ ও সোনা এই দুটি অত্যন্ত বহুকাঙ্ক্ষিত পণ্য যোগাড় করতে হিন্দু বণিকরা সক্ষম ছিলেন। তাঁরা ব্যবসায়িক কারণে আচেতে আসার পথে পর্তুগীজ ও মুসলমানদের বাধা হয়ে দাঁড়াতে দেন নি।

আচিন সুমাত্রাস্থিত ভারতীয়দের প্রধান ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল। বলা হয় যে আচিনের বণিকরা 'অধিকাংশই ছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভুত'।[১০৫]

১৬০৩ সালে স্যর জেমস ল্যাংকাস্টার আচিনে এসে দেখেন যে সেখানে নোঙর

করা যোলটি বা আঠারটি জাহাজের মধ্যে গুজরাতি জাহাজ রয়েছে।[১০৬] ১৬১৩ সালে টমাস বেস্ট আচিনে গুজরাতি বণিকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন, কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে আচিনের রাজার দ্বারা সম্প্রতিবিজিত টিকু, প্রিয়ামন বা অন্যান্য স্থানের সঙ্গে ব্যবসা করা থেকে তাদের বিরত রাখা হয়েছে, 'কারণ অঞ্চলটি তাদের দ্বারা আনীত বস্ত্রসামগ্রীতে ইতিমধ্যেই পরিপূর্ণ'।

আচিনের গুজরাতিরা ছিলেন বিত্তবান।[১০৭] কিন্তু ইতিমধ্যেই তারা ইউরোপীয় প্রতিযোগিতার মুখে পড়েছিলেন।[১০৮] ১৬৩৮ সালে ওলন্দাজ কুঠিয়াল টুইস্ট লিখেছিলেন যে প্রতিবছর ১০০ থেকে ৩০০০ টনের গুজরাতি জাহাজ 'আফিম, তুলো ও নানাবিধ গুজরাতি কাপড়' নিয়ে মে মাসে আচিনের উদ্দেশে যাত্রা করত। তারা ফেরার পথে আনত গোলমরিচ ও অন্যান্য মশলা, গন্ধক, বেনজোয়িন কর্পূর, চীনামাটির জিনিস ও টিন।[১০৯]

আচিন, যোড়শ শতকের গোড়ায় পিরেস যার নামকরণ করেন আচে, সেটি একটি 'জলদস্যু' ভূমি থেকে এক শতকের মধ্যে একটি গঞ্জ হয়ে উঠেছিল। ১৫১১ সালে পর্তুগীজরা মালাক্কা দখল করলে গুজরাতি ও অন্যান্য মুসলমান বণিকরা এখানে সরে আসেন এবং সপ্তদশ শতকের সূচনার মধ্যেই এটি মালাক্কার সঙ্গে প্রতিযোগিতা শুরু করে।[১১০] সমগ্র ষোড়শ শতক ধরে গুজরাতিরা এই বন্দরে আসতেন যদিও তাঁরা 'সুমাত্রার পশ্চিম উপকূলস্থ প্রিয়ামন, টিকু এবং মিনাঙ্কাবু'র বারোস বন্দরেও' যেতেন।[১১১]

সুলতান ইস্কান্দার মুদা'র শাসনকালে (১৬০৭-৩৬) আচে পশ্চিমী দ্বীপপুঞ্জের শীর্ষস্থানীয় সামরিক শক্তি হয়ে দাঁড়াল। বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে এটি মালাক্কার প্রতিপক্ষ হয়ে উঠল। ১৬০১ সালে দু'জন ওলন্দাজ বণিক হান্স দ্য ওল্ফ এবং লেফার আচিন থেকে প্রত্যাগত একটি গুজরাতি জাহাজে সুরাত পৌঁছান। আচে'র সুলতান তাদের হাতে মুঘল বাদশাহের উদ্দেশে লিখিত একটি পরিচয়পত্র দেন।

ভারতীয় বণিকদের জন্য পর্তুগীজদের মালাক্কা দখল সাময়িক প্রতিকূলতা ছিল মাত্র। তাদের অনেকেই, বিশেষত মুসলমানরা, পর্তুগীজ নিয়ন্ত্রণের বাইরে আচিন ও অন্যান্য বন্দরে নিজেদের কাজকর্ম সরিয়ে নিয়ে যান।[১১২] ১৬১৩ সালে আচে'র সুলতান জোহোরকে পরাস্ত করেন এবং ১৬১৪ সালে তিনি পর্তুগীজ ও মালয় উপদ্বীপের অন্যান্য শাসকদের পরাজিত করেন। এর পরিণতিতে আচে এখন 'উত্তর সুমাত্রার বাণিজ্য বন্দরগুলির উপর আধিপত্য বিস্তারকারী শক্তি হয়ে উঠল'।[১১৩] এটি মালাক্কাকে প্রতিস্থাপন করল এবং ভারতীয়দের আগমনের প্রধান বন্দর হয়ে উঠল।

Scanned with CamScanner

১৬২১ সালে আচে'র শাসক মসুলিপটনমের বণিকদের কাছে শস্তা দরে গোলমরিচ বিক্রি করার অনুমতি দেন।[১১৪]

করমন্ডলের বস্ত্র বিপণনের একটি কেন্দ্র হয়ে ওঠে আচিন, এখান থেকে সমগ্র সুমাত্রায় বস্ত্রসামগ্রী পৌঁছত।[১১৫]

এই জন্য বণিকরা আচেতে ভিড় জমান, ভারতীয় বণিকরাও আচেতে এসেছিলেন। ভারতীয় মুসলমান বণিকরা যাদের মধ্যে গুজরাতিরাও ছিলেন, তারা ১৫১১ সালে পর্তুগীজদের মালাক্কা দখলের পর ষোড়শ শতকে আচেতে চলে আসেন। সুলতান মুদা'র মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা ইস্কান্দার থানি মুগায়াৎ সেহ্ (রাজত্বকাল ১৬৩৬-৪১) অল্প কিছু কালের জন্য রাজত্ব করেন। তাঁর পর চার জন রাণী ১৬৯৯ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ওলন্দাজরা মালাক্কা দখল করলে ভারতীয়দের পুনরায় স্থানান্তর ঘটে। ওলন্দাজদের এড়াতে ভারতীয় বণিকরা আচেতে চলে যান, যেমনটি তারা করেছিলেন ১৬শ শতকে পর্তুগীজদের দ্বারা মালাক্কা দখলের পর।

বস্তুত ভারত মহাসাগরের বণিকরা যাদের মধ্যে ভারতীয়রাও ছিলেন, তাঁরা সেইসব বন্দরে বেশী সফল হয়েছিলেন যেখানে ওলন্দাজরা 'আধিপত্যমূলক অবস্থান নিতে পারেন নি'।[১১৬] এই কারণে সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কিছু বাধাবিঘ্নের পর সুরাতের সঙ্গে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সমুদ্রযাত্রা পুনরায় শুরু হয়েছিল।[১১৭]

ওলন্দাজদের মালাক্কা দখল এবং যবদ্বীপের বাটাভিয়ায় আত্মপ্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও আচে'র সহায়তায় ভারতীয়রা জোহোরের সঙ্গে বাণিজ্য চালাতে পেরেছিলেন। সমগ্র সপ্তদশ শতক ধরে ইংরেজদের তরফে প্রতিযোগিতা এবং যবদ্বীপের উপরে ওলন্দাজদের দখল সত্ত্বেও ভারতীয়দের জন্য আচে ছিল সুরক্ষিত অঞ্চল।

ভারতীয় মুসলমানরা প্রধানত ইন্দোনেশীয় বন্দর শহরগুলিতে বিশেষত আচে ও ব্যান্টামে ঘাঁটি গাড়তে পেরেছিলেন। ওলন্দাজ ও ইংরেজরা তাদের ভারতীয় প্রতিযোগীদের ঘৃণা করতেন কারণ তাঁরা 'প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বণিকদের স্থানীয় চাহিদা সম্পর্কে জ্ঞান এবং পণ্যের স্বল্প মূল্যকে অতিক্রম করতে পারতেন না'। তাঁরা দাবী করতেন যে চুলিয়া ফিরিওয়ালারা (Choullyas) ষোলশ সত্তরের দশকে ভারতীয় বস্ত্রবাজারে ইংরেজদের ব্যবসার সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করে দিয়েছিলেন।[১১৮] 'আচেতে যতদিন ওলন্দাজরা ভারতীয়দের যাতায়াত করতে দিয়েছিলেন ততদিন ইংরেজদের ব্যবসা বন্ধ রাখতে হয়েছিল, কিন্তু ওলন্দাজরা ভারতীয়দের আটকে দিলেই ইংরেজরা প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হন'। শেষ পর্যন্ত ওলন্দাজরা ভারতীয়দের ব্যবসা করতে দিয়েছিলেন।

আচে'র ভারতীয় জনগোষ্ঠী ওলন্দাজদের প্রতি গৃহীত মুঘল নীতি'র পরোক্ষ সহায়তা লাভ করেছিলেন। মুঘল শাসকশ্রেণী আচে ও সন্নিহিত অঞ্চলের সঙ্গে সামুদ্রিক বাণিজ্য চালাতে উৎসাহী ছিলেন। আচে'র রাজবংশও মুঘলদের ইচ্ছার সমর্থক ছিলেন। ওলন্দাজরা মুঘল শাসককে সহায়তা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন কারণ এর প্রতি আচে'র শাসকের সমর্থন রয়েছে এবং এর ফলে তাঁরা মুঘল এলাকায় বিস্তৃত বাণিজ্যিক কাজকর্ম করার ক্ষেত্রে মুঘলদের অনুমতি পেয়ে যাবেন। ১৬৫১ সালে ওলন্দাজরা আচেতে আসার জন্য অনুমতিপত্র নেওয়ার শর্তটি তুলে নিলেন। দু'বছর পরে ওলন্দাজ কোম্পানি 'আচে ও অন্যান্য অঞ্চলগামী' সমস্ত ভারতীয় জাহাজের জন্য অনুমতিপত্র দিতে স্বীকৃত হল।[১১৯]

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের একটি গুরুত্বপূর্ণ মিলনকেন্দ্র হয়ে উঠল আচে, প্রায় ষোড়শ শতকের মালাক্কার মত।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় যখন ইংরেজ ও ওলন্দাজ পূর্বভারতীয় কোম্পানিগুলি এল তখন আচেই ছিল তাদের গন্তব্যভূমি কারণ পর্তুগীজ-অধিকৃত অঞ্চলে তাদের আগমন ভাল চোখে দেখা হত না। ষোড়শ শতকে পর্তুগীজরা মালাক্কা দখল করার সূত্রে যখন মালাক্কা ও অন্যান্য প্রণালীতে জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করলেন তখন দেশীয় জনসাধারণ, করমণ্ডল থেকে যাওয়া ভারতীয়রা (হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই) এবং পর্তুগীজদের হস্তক্ষেপের ভয়ে ভীত অন্যান্যরা যবদ্বীপের উত্তর উপকূলের বন্দরগুলিতে চলে যান। এর মধ্যে ব্যান্টাম বা ব্যান্টেন তাদের কাজকর্মের কেন্দ্র হয়ে উঠল।[১২১] হাসানুদ্দিনের শাসনকালে (১৫৫২-৭০) ব্যান্টাম গোলমরিচ রপ্তানীর গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে এবং দক্ষিণ সুমাত্রার লামপুঙ্ এলাকার গোলমরিচ উৎপাদনক্ষেত্রগুলির উপর নিজ কর্তৃত্ব স্থাপন করে।[১২২]

একথা পরিষ্কার যে ভারতীয় মুসলমানদের, বিশেষত গুজরাত থেকে আগত ব্যক্তিদের যবদ্বীপের উত্তর উপকূলের বন্দরগুলির সর্বত্র দেখা যেত। তারা গুজরাতি বণিকদের শক্ত ঘাঁটি ব্যান্টেন থেকে এসেছিলেন।[১২৩]

ভারতীয়রা ব্যান্টেনে তাদের ছাপ রেখে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সরকারের উঁচু পদ দখল করেন। শাহবন্দর এবং নৌ-সেনাপতি দু'জনেই ছিলেন 'ক্রিঙ্'।[১২৪] শাহবন্দর ছিলেন মেলিয়াপুরের লোক এবং রাজার পরিষদের একজন সদস্য।[১২৫]

গুজরাতিরা কাপড় বিক্রি করে গোলমরিচ কিনতেন। ১৫৯৮ সালে একটি জাহাজে ৩,০০০ বস্তা গোলমরিচ নিয়ে গিয়েছিলেন।[১২৬] এর থেকে স্থানীয় গোলমরিচের ব্যবসায় গুজরাতিদের নিয়ন্ত্রণ বুঝতে পারা যায়।

Scanned with CamScanner

গুজরাতিরা প্রতিবেশী অঞ্চলগুলির বণিকদের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তোলেন। ১৬১৬ সালে একজন গুজরাতি বণিকের সঙ্গে সংলগ্ন জেপারা বন্দরের মুসলিম বণিকদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল।[১২৫]

ওলন্দাজরাও ব্যান্টেনের গোলমরিচের ব্যবসার উপর গুজরাতিদের কঠোর নিয়ন্ত্রণের কথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁদের মতে একজন গুজরাতিই গোলমরিচের মহার্ঘতার জন্য দায়ী কারণ 'সে ইউরোপে গেছে এবং কত বেশী দামে তা বিক্রি হয় তা জানে'।[১২৬]

কিছু ভারতীয় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন যিনি আদতে ছিলেন দিল্লীর বাসিন্দা, তিনি একটি জাংক কেনেন। তিনি সম্ভবত মশলা দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে যবদ্বীপের বাণিজ্যে সক্রিয় ছিলেন এবং বিভিন্ন দ্বীপে যাতায়াতের জলপথের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সেজন্য ওলন্দাজরা '২০০ রিয়ালের' বিনিময়ে তাঁকে ওলন্দাজ জাহাজগুলিকে মলুক্কা দ্বীপে নিয়ে যেতে বলতেন।[১২৭]

আমরা এ কথা জানি যে ১৬১৮ সালের অগাস্ট মাসে মাতরমের শ্রেষ্ঠ শাসক অগুঙের (শাসনকাল ১৬১৩-৪৬) প্রতিনিধি হিসাবে শাসনকারী জেপারা'র (মাতরমের বন্দর) গুজরাতি শাসক ওলন্দাজদের ঘাঁটি আক্রমণ করেছিলেন। মেইলিংক-রীলোফ্‌জ মনে করেছেন যে ঐ শাসক ছিলেন গুজরাতি বা পারসীক।[১২৮] তাঁর আক্রমণে তিনজন ওলন্দাজ নিহত হন এবং বাকিরা বন্দী হন। প্রতিশোধ নিতে ওলন্দাজদেরও বিশেষ দেরী হয়নি। ১৬১৮ সালের নভেম্বরে ওলন্দাজরা জেপারা'র সবকটি যবদ্বীপীয় জাহাজ পুড়িয়ে দেন এবং ১৬১৯ সালে কেন (Coen) বাটাভিয়া জয়ের পথে আবার তাতে অগ্নিসংযোগ করেন।[১২৯] এই স্থানটিই সমগ্র দ্বীপপুঞ্জে তাদের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। তবে, বণিকরা হাল ছেড়ে দেন নি এবং তারা প্রতিরোধ জারী রাখেন। ১৬২৮ সালে অগুঙ্ বাটাভিয়া আক্রমণ করে প্রভূত ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন।[১৩০]

যবদ্বীপের অর্থনীতিতে গুজরাতিদের ভূমিকাকে ওলন্দাজরা প্রবলভাবে অপছন্দ করতেন, বিশেষত গোলমরিচের ব্যবসায় তাদের ভূমিকাকে, কারণ ঐটি ছিল তাঁদের প্রধান ভাবনার বিষয়। ওলন্দাজ শাসক কেন গুজরাতিদের সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিলেন। জেপারা আক্রমণের সময় ওলন্দাজ সৈনিকদের পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হয় যে, 'একজন গুজরাতিও যেন পালাতে না পারে'।[১৩১]

অগুঙ্ ওলন্দাজদের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসাবে পর্তুগীজ ও ভারতীয়দের মদত দিতেন। তিনি মালাক্কার পর্তুগীজ ও ভারতীয় শাসকদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন।[১৩২]

ওলন্দাজদের প্রতি তাঁর সন্দেহ যুক্তিযুক্ত ছিল। ১৬২০ ও ১৬৩০ - এর দশকে বালামবাঙ্গানের হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজারা অগুঙের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে VOC-র সাহায্য চান। VOC সাহায্য দিতে অস্বীকার করে। ১৬৩৬-৪০ সালে অগুঙ্ এটিকে ধ্বংস করেন। কিন্তু, স্থানীয়রা যারা তখনও তাঁদের পুরনো ধর্ম মেনে চলছিলেন, তাঁদের উপর ইসলাম চাপিয়ে দিতে তিনি ব্যর্থ হন।[১৩৩] উচ্চবর্গের মানুষজন ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন এবং এর দ্বারা দ্বীপপুঞ্জের অ-মুসলিম, অ-খ্রিস্টান ভারতীয় জনগোষ্ঠীর দুর্দশা বৃদ্ধি পায়। ব্যান্টামের সুলতান সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে নিজস্ব পণ্যদ্রব্য কেনার জন্য করমণ্ডলে চুলিয়া দালালদের নিয়োগ করেছিলেন।[১৩৪]

গুজরাত ও ব্যান্টামের মধ্যে বাণিজ্যিক সংযোগের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন আমাদের কাছে রয়েছে। ১৬৮২ সালে যবদ্বীপের ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ ফিলিপিন্সের রাজধানী ম্যানিলাগামী দুটি জাহাজ আটক করেন, যার একটি ছিল আবদুল রে'র এবং অপরটি ছিল সুরাটের বণিকশ্রেষ্ঠ আবদুল গফুরের। জাহাজদুটির কাপ্তেনদের কাছে ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষের দেওয়া ছাড়পত্র ছিল যেখানে মালাক্কাকে সাময়িক বিরতির জন্য দাঁড়ানো যাবে এমন বন্দর হিসাবে এবং ম্যানিলাকে গন্তব্যস্থল হিসাবে দেখানো ছিল। জাহাজদুটি ব্যান্টেনে এসে দাঁড়ালে ওলন্দাজরা তাদের আটক করে। কাপ্তেনরা তাঁদের অজুহাত দেখান যে খাবার ও জলের অভাবে বাধ্য হয়েই তাঁদের এ কাজ করতে হয়েছে। জাহাজদুটিকে বাজেয়াপ্ত না করে জুন মাসে ওলন্দাজরা তাতে ১০,০০০ গিল্ডার মূল্যের পণ্য তুলে দেন ম্যানিলায় পাঠানোর জন্য। পরের বছর মার্চ মাসে জাহাজদুটি ফিরে আসে। ওলন্দাজরা এর থেকে কি লাভ করেছিলেন তা আমাদের জানা নেই। ওলন্দাজদের সঙ্গে আবদুল গফুরের সহযোগিতা জারি থাকে এবং তিনি আরও জাহাজ ম্যানিলায় পাঠান।[১৩৫]

এই ঘটনা প্রমাণ করে যে গুজরাত ও ব্যান্টেনের মধ্যে নিবিড় বাণিজ্যিক সংযোগ গুজরাতিদের ঐ অঞ্চলে থেকে যেতে সাহায্য করেছিল। ব্যান্টেন ইতিমধ্যেই ঐ অঞ্চলের এশীয় বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। ম্যানিলার তেজী বাণিজ্য ভারতীয়দের ঐ স্থানে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়। একথা আমাদের জানা নেই যে ভারতীয় বণিকরা জাহাজ চলে যাওয়ার পরেও ম্যানিলায় থেকে যেতেন নাকি তাঁরা ছিলেন শুধুই ক্ষণিকের অতিথি।

সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার উপর ওলন্দাজদের প্রাধান্য স্থাপনে ব্যর্থতা ভারতীয়দের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল, তাঁরা ওলন্দাজদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত অঞ্চলগুলিতে ব্যবসা চালিয়ে যান। ওলন্দাজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি ভারতীয়দের সমর্থনের গুরুত্ব উপলব্ধি

Scanned with CamScanner

করেন এবং তাঁদেরকে নিজ নিজ ব্যবসায়িক পরিকল্পনার অঙ্গীভূত করে নিতে চান। ফলত ভারতীয় জনগোষ্ঠী শুধু টিকেই থাকে নি, অতীতের মতই সফলভাবে ব্যবসা চালাতে থাকেন।

যবদ্বীপের একটি স্বাভাবিক পোতাশ্রয় ছিল গ্রিসে। এখানে ভারতীয়রা সচরাচর সাময়িক বিরতির জন্য থামতেন, বিশেষত ১৫১১ সালে পর্তুগীজদের দ্বারা মালাক্কা থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর। বাংলা, কালিকট ও গুজরাত থেকে ভারতীয় বণিকরা এখানে আসতেন।[১৫৮]

কিন্তু অ-মুসলিম ভারতীয়দের সংকটে পড়তে হত। ঐ দ্বীপময় দেশে ইসলামের দ্রুত বিস্তার ঘটছিল।। ১৬০৮-১১ সালের মধ্যে বুগিস - ম্যাকাসর অঞ্চলের ধর্ম হয়ে ওঠে ইসলাম।[১৫৯] এর কারণ ছিল ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি বড় বড় রাজ্যগুলির কাছ থেকে সমর্থন আশা করত, এবং সেগুলি ইতিমধ্যেই ইসলামকে ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছিল। ইসলামের ক্রমবিস্তারের দিকে ঝোঁকের নিদর্শন পাওয়া যাবে এই তথ্য থেকে যে ১৬৩৩ সালে অগুঙ্ দরবারী কাজকর্মে ভারতীয় শকাব্দের ব্যবহার সরকারীভাবে পরিত্যাগ করলেন। তিনি একটি মিশ্র প্রকৃতির যবদ্বীপীয় ইসলামী পঞ্জিকা গ্রহণ করলেন।[১৬০]

১৬৮২ সালে ওলন্দাজরা শেষ পর্যন্ত ব্যান্টেন দখল করলেন যাতে করে তাঁরা যবদ্বীপের গোলমরিচের বাণিজ্যে সব ধরণের ভারতীয় ও এশীয় প্রতিযোগিতাকে হঠাতে পারেন। করমণ্ডলের পর্তুগীজরা ওলন্দাজ বিরোধিতার সম্মুখীন হলেন। ১৬৪০ সালের মে মাসে ওলন্দাজরা স্থির করেন যে 'পেগু, আচিন ও অন্যান্য গন্তব্যস্থলের অভিমুখে রওনা হওয়া যে সব ভারতীয় জাহাজে পর্তুগীজ পণ্য থাকবে তার সবকটিকে ওলন্দাজ রণতরী আটক করে শত্রুদের (পর্তুগীজদের) পণ্য জমা দিয়ে দিতে বাধ্য করবে।'[১৬১] এর ফলে করমণ্ডলের পর্তুগীজদের জাহাজ চলাচলের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং ১৬৪০-৪১ সালে তাঁরা 'একটি জাহাজও বিদেশে পাঠাতে' সক্ষম হন নি।[১৬২]

ওলন্দাজদের মত ইংরেজরাও করমণ্ডলের সঙ্গে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যে তৎপর হয়ে ওঠেন। তাঁরা এতই বেশী পরিমাণে ভারতীয় বস্ত্র আচিনে (আচে) নিয়ে যেতেন যে সেখানে ভারতীয় বস্ত্র বিক্রি হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে।[১৬৪]

দক্ষিণপূর্ব এশিয়াগামী ভারতীয় বণিকরা ইউরোপীয় বাণিজ্যনীতির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হতেন। যেমন, ১৬৩০ ও ১৬৪০-এর দশকে ওলন্দাজরা স্থানীয় বণিক চিনায়াকে

আদেশ করেন যে 'পেগুর সঙ্গে তাঁরা বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে' এবং পরিবর্তে পেগু থেকে আমদানী করা সমস্ত পণ্য তাঁকেই তাঁরা বিক্রি করবে।[১৬৩]

এসব অসুবিধা সত্ত্বেও ভারতীয়রা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় পাড়ি জমাতেন এবং ওলন্দাজরা ভারতীয়দের আগমনকে স্বাভাবিক ঘটনা বলেই মেনে নিয়েছিলেন ও ভারতীয়দের পণ্যসহ নিজস্ব জাহাজে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় নিয়ে যেতেন।[১৬৪] ভারতীয় বণিকরা এতটাই ভালভাবে ঐ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন যে কেডার রাজার সঙ্গে তাঁরাও ওলন্দাজ ছাড়পত্র ছাড়াই করমণ্ডলে জাহাজ পাঠাতেন।[১৬৫]

ওলন্দাজরা মালাক্কা দখল করা সত্ত্বেও ভারতীয় বণিকরা কোম্পানির লাভের পথে কাঁটা ছিলেন। তাই ১৬৪৭ সালে ভারতের ওলন্দাজ কুঠিগুলিকে 'আচিন, মালাক্কা ও 'টিন ক্ষেত্র' (পেরাক, কেডা, উজাঙ্-সালাঙ্ (জাঙ্ক-সিলোন) নিয়ে গঠিত) এবং আর পূর্ব-দিকে রওনা হওয়া ভারতীয় জাহাজগুলিকে ছাড়পত্র দান করতে নিষেধ করা হল'। ঐ নিষিদ্ধ এলাকা অভিমুখে যাত্রা করা সব জাহাজকেই বৈধভাবেই আটক করা হবে।[১৬৬]

ওলন্দাজদের নিয়ন্ত্রণ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারতীয়দের ও ভারতীয় জাহাজগুলির অভিযানকে ঠেকাতে পারে নি। ভারতীয়রা ওলন্দাজ হুমকিকে স্রেফ উপেক্ষা করেছিলেন। ১৬৬৬ সালে শ্রী কাকোলের কাজী তেনাসেরিমে জাহাজ পাঠিয়েছিলেন, 'কেবল ইংরেজ ছাড়পত্র সহ, ...এবং হিন্দু বণিকরা কোন ধরণের ছাড়পত্র ছাড়াই মালাক্কায় যাত্রা করতেন।[১৬৭]

ওলন্দাজদের চাপানো নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর জন্য ভারতীয়দের গৃহীত উপায়গুলির একটি হল লাভের মাত্রা কম রাখা।[১৬৮] যেমন, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ভারতীয় বণিকরা ২০% লাভে তাঁদের কাপড় বেচতেন এবং 'সোনা ও জাপানী কোনবাগ' কেনার জন্য তা ব্যয় করতেন যা থেকে তাঁদের 'করমণ্ডলে আরও ১৫% লাভ হত'।[১৬৯]

ভারতীয়রা আরেকটি যে উপায় অবলম্বন করতেন তা হল তাঁরা তত্ত্বগতভাবে 'তাঁদের জাহাজ বিক্রি করে দিতেন', যেগুলি তারপর ইউরোপীয় নিশানধারী হয়ে ব্যান্টান সহ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সর্বত্র বিচরণ করত।[১৭১] বাহ্যত এসব ব্যবস্থা সফল হয়েছিল। '১৬৮১ সালে কেবল পোর্টো নোভো থেকে ১২ হাজার গাঁটেরও বেশী কাপড় নিয়ে ২৮টি জাহাজ আচিন, কেডা, ম্যানিলা ও বাংলার উদ্দেশে যাত্রা করে'।[১৭২]

১৬৮১-৮২ সালে উত্তর করমন্ডলের পুলিকট, পোর্টো নোভো ও নেগাপটনম বন্দর থেকে আচিন, আরাকান, পেগু, ম্যাকাও, তেনাসেরিম, মালাক্কা, ম্যানিলা, উজাঙ্-সেলাঙ্ ইত্যাদি অভিমুখে যাত্রা করে, যার থেকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারতীয়দের নিয়মিত অভিবাসনের প্রমাণ মেলে।

Scanned with CamScanner

প্রথম তিনজন গভর্নর-জেনারেলের আমলে (১৬১০-১৯) ওলন্দাজদের সদর দপ্তর ছিল আম্বোনে, কিন্তু ইয়ান পিয়েটারজুনের আমলে (১৬১৯-২৩) তা বাটাভিয়া বা জাকার্তায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।[১২৫] এখন থেকে বাটাভিয়া হল প্রাচ্যে ওলন্দাজ বাণিজ্যের সদর দপ্তর। ভৌগোলিকভাবে এই স্থানটি মালয় থেকে মলুক্কাস পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত। সুতরাং, ওলন্দাজরা তৎপরতার সঙ্গে মালাক্কা প্রণালী সংলগ্ন মালয় ও সুমাত্রায় অবস্থিত বন্দরগুলিতে এবং ম্যাকাসর ও মলুক্কাস দ্বীপপুঞ্জের মশলা দ্বীপে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন। সপ্তদশ শতকে ভারতীয় জনগোষ্ঠীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হত ওলন্দাজ বণিকদের সঙ্গে, যাঁরা, পর্তুগীজদের মতই, নিজেদের দাবীদাওয়ার সমর্থনে নৌশক্তিকে ডেকে আনতেন।

ওলন্দাজদের পরে এল ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। তবে ওলন্দাজদের মত তাঁরা দাপট দেখাতে পারেন নি। ১৬২৩ সালে আম্বোনিয়ায় ইংরেজদের গণহত্যা করা হলে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিজেদের ব্যবসাপত্র কমিয়ে ফেলে এবং ও অঞ্চলে ওলন্দাজদের কাছ থেকে সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সতর্ক থাকে।

তবে ভারতীয়রা সাফল্যের সঙ্গেই ওলন্দাজ প্রতিযোগিতা ও নিপীড়নের মোকাবিলা করেছিলেন। তাঁরা সমগ্র সপ্তদশ শতক ধরেই স্বদেশ অর্থাৎ ভারত ভূখণ্ড থেকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বন্দরগুলিতে জাহাজ পাঠাতেন ও সেখানে বসবাস করতেন।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ভারতীয় বণিকরা করমন্ডলের বণিকদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছিলেন বলেই মনে হয়। করমন্ডলের বণিকরা নিয়মিত কাঁচা ও প্রস্তুত চামড়া শ্যামদেশে পাঠাতেন যেখান থেকে সেগুলি 'চীনা বণিকরা জাপানে নিয়ে যেতেন'।[১২৪] ১৬৫৪ সালে ওলন্দাজরা জানিয়েছিলেন যে তাঁদের লাভ কম হচ্ছে।[১২৫]

গুজরাতিরাও শ্যামদেশে এসে পৌঁছেছিলেন।১৬৬৩ সালে *সুরাট* নামক জাহাজটি, যার মালিক ছিলেন মোন্ডাস নায়েম এবং কাপ্তেন ছিলেন জনৈক ওলন্দাজ ডিরিক ফান ডে ভেল্‌ডে, সেটি সুরাট থেকে শ্যামে এসে পৌঁছল। মনে হয় জাহাজের মালিক ছিলেন হিন্দু। এর থেকে দেখা যায় যে প্রয়োজন হলে ওলন্দাজরা ভারতীয়দের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলতে দ্বিধা করতেন না।[১২৬]

করমন্ডলের কাপড়ও তেনাসেরিম হয়ে শ্যামে পৌঁছত।[১২৭] ম্যাকফারসন লক্ষ্য করেছেন যে 'সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজ ও ওলন্দাজরা যখন আয়ুথিয়ার লাভজনক বাণিজ্যে ঢুকে পড়তে চাইলেন তখন তারা দেখেন যে করমণ্ডলের বাণিজ্য সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত'।[১২৮]

সাধারণভাবে বলা চলে যে কেলিঙ্ বা ক্লিঙ্ (যে নামে হিন্দু বণিকদের ডাকা হত) ও পর্তুগীজদের মধ্যে এক ধরণের ঝোঝাপড়া চলত। ভারতীয় মুসলমানরা যাঁদের মধ্যে ছিলেন চুলিয়া, গুজরাতি, মালাবারি প্রমুখ, তাঁরা প্রধানত পর্তুগীজ প্রভাবমণ্ডলের বাইরে অবস্থিত বন্দরগুলিতে সক্রিয় ছিলেন। খ্রিস্টানরা (ভারতীয়সহ) পর্তুগীজ প্রভাবাধীন বন্দরগুলিতে সক্রিয় ছিলেন। কিন্তু প্রায়শই এর ব্যত্যয় ঘটত।

ভিন্ন প্রকারের কর্মকাণ্ড

ভারতীয়রা বাণিজ্য ছাড়া অন্যান্য কাজও করতেন। বাণিজ্যের বাইরে তাঁরা কি কাজ করতেন তা বিশদভাবে আমরা বলতে পারব না কারণ সে সম্পর্কে তথ্যাবলি অত্যন্ত কম। আমাদের প্রধান তথ্যসূত্র হল কোম্পানিগুলির কাগজপত্র যেখানে কোন কোন সময় ভারতীয়দের বাণিজ্য-বহির্ভূত কাজকর্মের কথা বলা হয়েছে।

ভারতীয়রা স্থানীয় সেনাবাহিনীতে কাজ নিতেন। ১৬৪০-৪১ সালে মালাক্কায় পর্তুগীজদের আনুমানিক '৫০০ কৃষ্ণাঙ্গ সেনা' ছিলেন। এরা সম্ভবত ছিলেন অ-মুসলিম ভারতীয়, কেননা স্থানীয় জনগণ পর্তুগীজ বাহিনীতে যোগ দেবেন না।[১২৯]

অনেক ভারতীয় ভারত থেকে আগত জাহাজে কর্মী ছিলেন। মালয় ও ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের নানা স্থানে চলাচল করা জাহাজেও তাঁরা কাজ পেতেন।

তথ্যের অপ্রতুলতার জন্য মালাক্কা ও অন্যত্র ভারতীয়দের সামাজিক জীবনযাত্রার কথা বিশদে বলা যাবে না। ১৬৭৮ সালে তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন ৭৬১, যার মধ্যে পুরুষ ৩৭২ জন (হিন্দু ও মুসলমান মিলিয়ে)। মহিলা ছিলেন ১০০ ও শিশু ৭৫ জন। দাসের সংখ্যা ৮৬, যার মধ্যে পুরুষ ৩৫ ও নারী ৫১। দাসদের সন্তানের সংখ্যা ছিল ১২৮।

মনে হয় যে হিন্দু ঘরের দাসীরা ছিলেন হয় স্থানীয় মালয়ী নারী বা দাসী।[১৩০]

ধনী হিন্দু বণিকরা ভারত থেকে ভৃত্য, পাচক, ঘরদোর পরিষ্কার রাখার কাজের লোক নিয়ে আসতেন। তাঁদের নিজস্ব ধোপা ছিল যাঁরা পর্তুগীজদেরও কাজকর্ম করে দিতেন।[১৩১]

সেকালে জাহাজ চলাচল বায়ুপ্রবাহের উপর নির্ভর করত। করমণ্ডলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বন্দর মসুলিপটনম, যেখান থেকে বাংলা, আরাকান, পেগু, তেনাসেরিম, মালাক্কা, জোহর, আচে, ব্যান্টাম, ম্যাকাসর, আয়ুথিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বাণিজ্য চলত, সেটি অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে বন্ধ থাকত।[১৩২] ওলন্দাজরা ইউরোপ থেকে

Scanned with CamScanner

দক্ষিণপূর্ব এশিয়া যাওয়ার পথে ভারতকে এড়িয়ে যেতেন এবং 'গর্জনশীল চল্লিশা'র সাহায্যে ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছতেন।

মালয় উপদ্বীপ ও ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ বিপরীতমুখী বায়ুপ্রবাহের সংযোগস্থলে অবস্থিত, সেজন্য বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা বন্দরে পৌঁছতে নাবিকদের বিশেষ দক্ষতা দেখাতে হত। মালাক্কার উন্নতি ঘটার কারণ হল এটি ছিল দুটি বায়ুপ্রবাহের সংযোগস্থলে অবস্থিত—"এমন একটি বিন্দুতে যেখানে দুটি মৌসুমী বায়ু নিস্তেজ হয় পড়ে..."।[১৬৩]

উপসংহার

যে ভারতীয় জনগোষ্ঠীর কথা আমরা বললাম তার মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন বণিক। তাঁরা ছিলেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ এবং তাঁরা অনুসরণ করতেন হিন্দুধর্ম, ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্ম। একথা পরিষ্কার যে ভারতীয়দের মধ্যে গুজরাত ও করমণ্ডলের বণিকরাই ছিলেন প্রধান। গুজরাতিরা ছিলেন প্রধানত মুসলমান এবং করমণ্ডলের বণিকদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টানরা ছিলেন। সময়ভেদে অঞ্চলভেদে করমণ্ডলের এই তিনটি সম্প্রদায়ই দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বন্দর শহরগুলির স্থানীয় অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। মালাক্কা, আচিন ও ব্যান্টাম ছিল প্রধান তিনটি কেন্দ্র যেখান থেকে ভারতীয়রা মুখ্যত কাজকারবার চালাতেন। তাঁদের মহত্তম সাফল্য ছিল তাঁদের টিক থাকার ক্ষমতা। স্থানীয় ও ইউরোপীয় সব ধরণের বিরোধিতা সহ্য করে তাঁরা পাদপ্রদীপের আলোয় থেকে যেতে পেরেছিলেন। অতীতের সেইসব স্বদেশীয় মানুষদের জানাই অকুণ্ঠ অভিবাদন।

সূত্রনির্দেশ ঃ-

১। চার্লস লিন্ডেন, "দি ইন্ডিয়ান ওশেন ঃ দি এনশেন্ট পিরিয়ড অ্যান্ড দি মিডল এজেস' প্রবন্ধটি রয়েছে সতীশ চন্দ্র (সম্পা.) *দি ইন্ডিয়ান ওশেন, এক্সপ্লোরেশনস ইন হিস্ট্রি, কমার্স অ্যান্ড পলিটিক্স*, নতুন দিল্লী, ১৯৮৭, পৃপৃ. ২৭-৫৩। আরও দেখুন সতীশ চন্দ্র, 'ইন্ডিয়া'স ম্যারিটাইম ট্রাডিশান — এ রিভিয়্যু' প্রবন্ধটি রয়েছে *জার্নাল অফ ইন্ডিয়ান ওশেন স্টাডিজ*, দ্বিতীয় খণ্ড, সংখ্যা ২, অগাস্ট ২০০৩, পৃপৃ. ২৭৫-৭৮।

২। জে. গার্নেট, *এ হিস্ট্রি অফ চাইনিজ সিভিলাইজেসন*, ১৯৮৮, পৃ. ২৮০।

৩। রকহিল, 'নোটস অন রিলেশনস অ্যান্ড ট্রেড অফ চায়না উইথ দি ইস্টার্ন আর্কিপেলাগো অ্যান্ড দি ইন্ডিয়ান ওশেন ডিউরিং দি ফিফটিনথ সেনচুরি' (প্রবন্ধ) রয়েছে তুঙ্ পাও, পঞ্চদশ খণ্ড, ১৯১৪, পৃপৃ. ৪২৩-৪৪। ইয়ামামোতো, 'ইন্টারন্যাশানাল রিলেশনস বিটুইন চায়না অ্যান্ড দি কান্ট্রিজ অ্যালং দি গঙ্গা ইন দি আর্লি মিড্ পিরিয়ড' (প্রবন্ধ) রয়েছে *ইন্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রিভিয়ু (IHR)*, পঞ্চম খণ্ড, সংখ্যা ১, জুলাই ১৯৭৭,

পৃপৃ ১৩-১৯। হরপ্রসাদ রায়, *ট্রেড অ্যান্ড ডিপ্লোম্যাসি ইন ইন্দো-চায়না রিলেশনস ঃ এ স্টাডি অফ বেঙ্গল ডিউরিং দি ফিফটিনথ সেনচুরি*, নতুন দিল্লী, ১৯৯৫।

৪। জি. আর. টিবেটস, *এ স্টাডি অফ দি অ্যারাবিক টেক্সটস কনটেইনিং মেটেরিয়াল অন সাউথ ইস্ট এশিয়া*, লাইডেন, ১৯৭৯।

৫। মুরলী এন. কৃষ্ণস্বামী, 'গ্লোরি অফ চেট্টিনাড', *দি হিন্দু*, ২৮ জানুয়ারী ২০০১।

৬। বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন এস. মুথাইয়া, মীনাক্ষী মেয়াপ্পান এবং বিশালাক্ষী রামস্বামী, *দি চেট্টিয়ার হেরিটেজ*, চেন্নাই, ২০০০।

৭। জি. ডি. উইনিয়াস ও পি. এম. উইংক, *দি মার্চেন্ট-ওয়ারিয়র প্যাসিফায়েড, দি ভি ও সি অ্যান্ড ইটস্ চেঞ্জিং পলিটিকাল ইকোনমি ইন ইন্ডিয়া*, দিল্লী, ১৯৯১, পৃ. ১৯।

৮। সিনাপ্পা আরসরত্নম ও অনিরুদ্ধ রায়, *মসুলিপটনম অ্যান্ড ক্যাম্বে এ হিস্ট্রি অফ টু পোর্টস ১৫০০-১৮০০*, মুনশিরাম, দিল্লী ১৯৯৪, পৃ. ১৯।

৯। সুসান বেইলি, সেইন্টস, গডেসেস অ্যান্ড কিংস

১০। আরসরত্নম, মার্চেন্টস, কোম্পানিজ...

১১। কেনেথ ম্যাকফারসন, 'চুলিয়াজ অ্যান্ড ক্রিঙ্ভজ ঃ ইন্ডিজেনাস ট্রেড ডায়াস্পোরাজ ইউরোপিয়ান পেনিট্রেশন অফ দি ইন্দোনেশিয়ান লিটোরাল' (প্রবন্ধ) রয়েছে বোর্সা (সম্পা.), *ট্রেড অ্যান্ড পলিটিক্স ইন দি ইন্ডিয়ান ওশেন হিস্টরিক্যাল অ্যান্ড কনটেম্পোরারি পার্সপেক্টিভ*, দিল্লী, ১৯৯০, পৃ. ৩৫।

১২। উইনিয়াস ও উইংক, পৃ. ১৯।

১৩। বেইলি, পৃ. ৮৩।

১৪। রেমকো রাবেন, 'ফেসিং দি ক্রাউড ঃ দি আর্বান এথনিক পলিসি অফ দি ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' (প্রবন্ধ) রয়েছে কে. এস. ম্যাথু (সম্পা), *মেরিনারস, মার্চেন্টস অ্যান্ড ওশেন*, দিল্লী ১৯৯৫, পৃ. ২১৮।

১৫। আরসরত্নম ও রায়, *মসুলিপটনম অ্যান্ড ক্যাম্বে*, পৃপৃ. ৫২, ৫৮।

১৬। সঞ্জয় সুব্রামনিয়ম, 'ইরানিয়ানস অ্যাব্রড ঃ ইন্ট্রা-এশিয়ান এলিট মাইগ্রেশন অ্যান্ড আর্লি মডার্ন স্টেট ফর্মেশন', *জার্ণাল অফ এশিয়ান স্টাডিজ*, ৫ (১৯৯২), ৩৪০-৩৬৩।

১৭। উইনিয়াস ও উইংক, পৃ. ১৮।

১৮। রেমকো রাবেন, 'ফেসিং দি ক্রাউড..' রয়েছে ম্যাথু (সম্পা), *মেরিনারস, মার্চেন্টস অ্যান্ড ওশেনস*, পৃপৃ. ২১৭, ২১৯।

১৯। আরসরত্নম, স্লেভ ট্রেড ইন দি ইন্ডিয়ান ওশেন ইন দি সেভেনটিনথ সেনচুরি' (প্রবন্ধ) রয়েছে ম্যাথু (সম্পা), *মেরিনারস, মার্চেন্টস অ্যান্ড ওশেনস*, পৃ. ১৯৯।

২০। তপন রায়চৌধুরী, পৃ. ১৬৫।

২১। তদেব, পৃ. ২০০।

২২। তদেব, পৃ. ২০২।

২৩। তদেব।

Scanned with CamScanner